Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata.	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 6, No.4 - 12, 1369 B.S (1962) – Year 7, No. 1, 1369 B.S. (1962).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: Good.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

এই সংখ্যার লেখা
ও লেখক :

সুভো ঠাকুর উবাচ

শ্রীঅরবিন্দ
অঃ শিশিরকুমার ঘোষ
ভারতীয় ভাস্কর্যের তাৎপর্য

দুর্গাদাস সরকার
কবিতা

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
ভাস্কর্য

অসিতকুমার হালদার
ভাস্কর্যকলা

শঙ্কর দাশগুপ্ত
ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী

শৈলশেখর মিত্র
কবিতা

রাণা বসু
ভাস্কর পরিচিতি :
প্রমথ মল্লিক

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা

যক্ষ : প্রাচ্যের ভাস্কর্যে
নিহিত ব্যঞ্জনার
মহিমান্বিত
অভিব্যক্তি।

সম্পাদক :
সুভো ঠাকুর

দাম : দুটাকা

সুন্দরম্। সপ্তম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। আশ্বিন। তেরশো উনসত্তর। আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। পঞ্চম খণ্ড।

পূজার আনন্দোৎসবে

লক্ষ্মী ঘি

A quality hair oil with century-old tradition

LAKSHMIBILAS

M. L. BOSE & CO. PRIVATE LIMITED

Lakshmibilas House, Calcutta

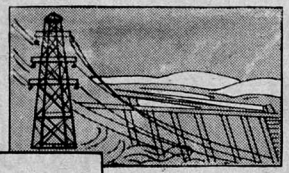

পুণ্য উৎসব দিন

নন্দনের

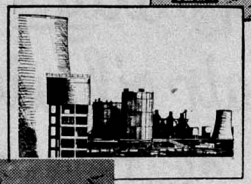

এনেছে সংবাদ

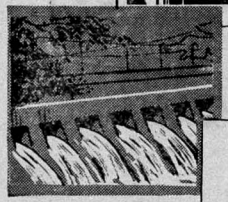

আজকে এই বহু প্রতীক্ষিত দিন আগের চেয়ে
অনেক বেশী আনন্দের বার্ত্তা বহন করে
এনেছে, কারণ এর আগে
কখনো এই মহান উৎসব
দেশের এমন বৈপ্লবিক উন্নয়নের
পটভূমিকায় অনুষ্ঠিত হয় নি।

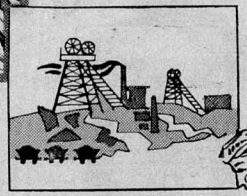

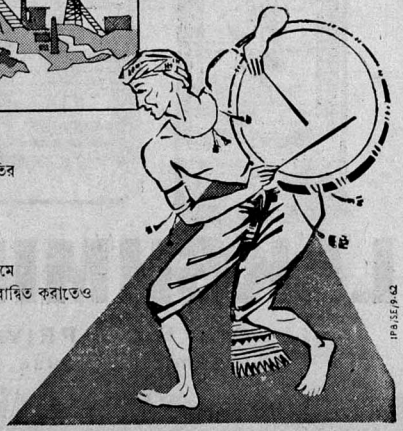

দেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৃহত্তম
সংস্থা রেলপথ সর্ব শক্তি নিয়োগ করে জাতির
অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় ও স্বনির্ভরশীল
করে তোলার প্রয়াসে নিরত রয়েছে।

তা ছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ও
তাঁদের ভাবসম্পদের আদান প্রদানের মাধ্যমে
জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং প্রগতিকে ত্বরান্বিত করাতেও
রেলপথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

IPB/SE/9-62

INDIAN RAILWAYS দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

উৎসবে

আনন্দে এবং নিত্য প্রয়োজনে

সর্ব্ববৃহৎ

বিভাগীয় বিপণি

কমলালয় ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা - ১৩

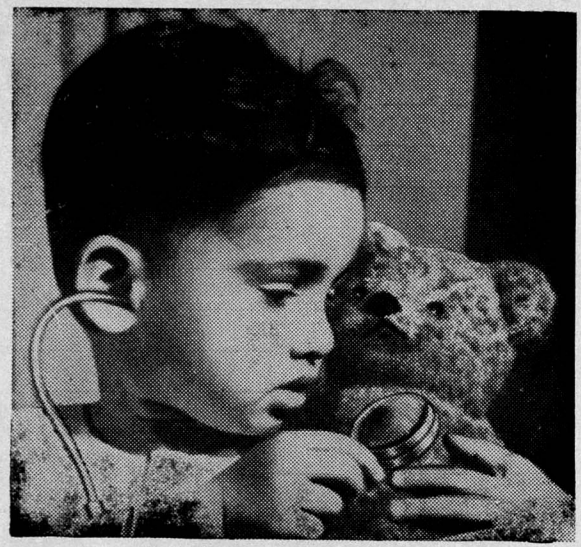

আপনার ঐ ছোট্ট ছেলেটির মধ্যেও **ডাক্তার** হবার সম্ভাবনা রয়েছে

এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার একটি সহজ ও সরল পরিকল্পনা আপনি করতে পারেন

আপনার ছেলেকে কোন ডাক্তারী কলেজে পাঁচ বছরের ডিগ্রি কোর্সে পড়াতে গেলে হষ্টেলের খরচা ছাড়াও কমপক্ষে ৭০০০ টাকার দরকার। ঠিক দরকারের সময়েই হয়ত আপনার পক্ষে এই খরচ মেটানো কষ্টকর হতে পারে। সুতরাং আজই আপনি আপনার ছেলের নামে জীবন বীমার একটি এডুকেশানাল পলিসি নিয়ে তার পড়ার খরচের টাকার সংস্থান করে নিশ্চিন্ত হোন। এর প্রিমিয়ামও খুব এমন বেশী নয়। ধরা যাক্ আপনার বয়স ২৫ বছর আর আপনার ছেলের বয়স দু'বছর। তাহলে এখন থেকে প্রতিমাসে ৩০.৭১ টাকা করে প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে থাকলে ছেলের বয়স ১৮ বছর হবার সময় থেকেই সে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর ধরে ষান্মাসিক কিস্তিতে ৭০০' টাকা করে পেতে থাকবে। (বলাবাহুল্য বয়সের তারতম্য অনুযায়ী প্রিমিয়ামও কমবেশী হবে।) সমস্ত প্রিমিয়াম দেবার আগেই যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহলেও আপনার ছেলেকে পলিসিতে উল্লিখিত দেয় টাকার সবটাই পাঁচ বছর ধরে ষান্মাসিক কিস্তিতে দেওয়া হবে। অন্য কোনরকম সঞ্চয়ের পরিকল্পনা থেকে আপনি এই বিশেষ সুবিধেটি পাবেন না। আপনার ছেলের জন্য আজই একটি জীবন বীমার এডুকেশানাল পলিসি নিন। আপনার সঙ্কল্পকে কার্যকরী করে তুলুন, ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখবেন না। কেন না আপনার বয়স যতই বাড়তে থাকবে প্রিমিয়ামের পরিমাণও ততই বাড়তে থাকবে। আপনার ছেলের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিতের দিকে ঠেলে না দিয়ে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের হাতে ছেড়ে দিন।

জীবন বীমার হাতে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ

ASP/LIC 79

পরিবারের জন্য সেরা উপহার

উৎসব ঋতুই তো উপহার দেওয়ার সময় আর উষা সেলাই কলের চেয়ে ভালো উপহার কি হতে পারে! একটি উষা সেলাই কল বাড়ীতে থাকলে কত উপকার হয়। আধুনিক ডিজাইনে গড়া প্রতিটি উষা মডেলে অনেক রকম সুবিধার ব্যবস্থা আছে। উষায় শুধু সেলাই হয় না, উষায় সেলাই করাটা আনন্দময়ও বটে।

সুবিধাজনক কিস্তির সর্ত স্থানীয় বিক্রেতার নিকট জেনে নিন।

চিত্রিত মেসিনগুলি হ্যাণ্ড, ফুট এবং ফোল্ডিং মডেলে পাওয়া যায়।

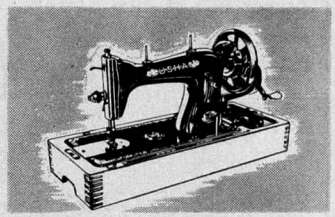

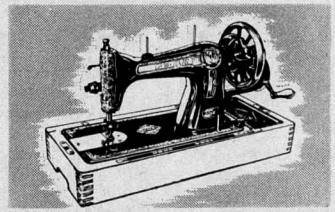

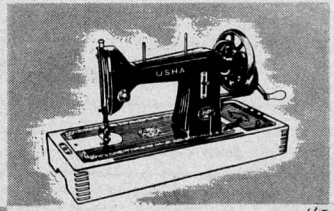

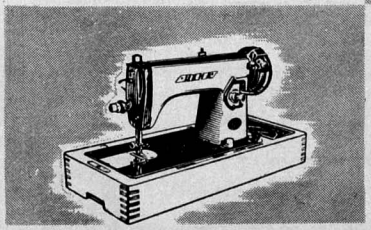

উষা কিনুন —
আরামে সেলাই করুন

উষা

সেলাই কল

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

"ত্রিপুরা প্রশাসন"

কৃষি অধিকর্ত্তা বিভাগ

ত্রিপুরার বিশিষ্ট ও উপাদেয় ফল আনারসে প্রস্তুত

(১) পাইন অ্যাপল জুস্।
(২) পাইন অ্যাপল স্লাইস্।
(৩) পাইন অ্যাপল জ্যাম্।
(৪) পাইন অ্যাপল জেলী।

কলিকাতা কার্য্যালয়
ও প্রাপ্তিস্থান
২০৮ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা - ২৯

ত্রিপুরা কার্য্যালয় : কৃষি বিভাগ
ফ্রুট প্রডাকটস্ আগরতলা
ত্রিপুরা

With best Compliments of :

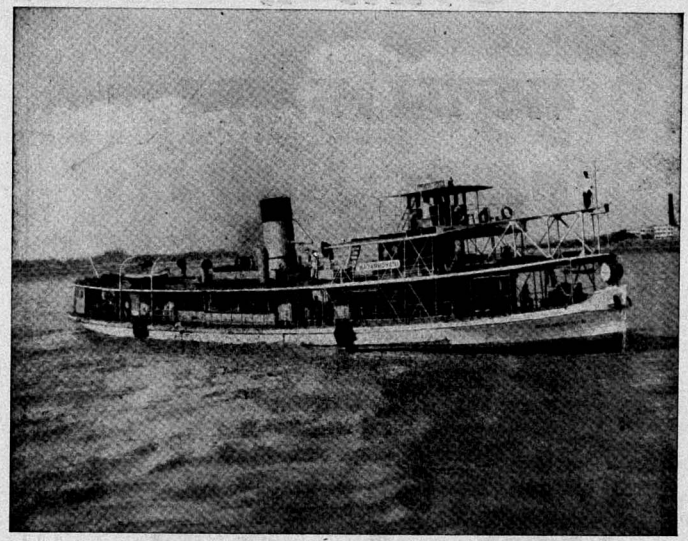

THE
EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LTD.

Managing Agents :

RAJA SREENATH ROY & BROS., PRIVATE LTD.

87, SOVABAZAR STREET, CALCUTTA-5

উদয়ভিলা
বাংলার হস্তশিল্পে
সমৃদ্ধি এনেছে

নারী সমবায় শিল্পাশ্রম
উদয়ভিলা, কামারহাটি, ২৪ পরগণা
ফোন : পানিহাটি, ২৬৬ এবং ২০৯

PLANNING
TO
BUILD?

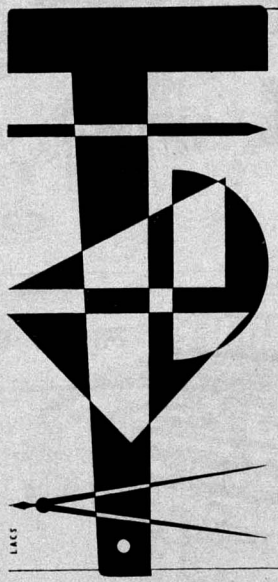

- To get Architects Draughtsmen to prepare Blue Prints for you is, after all, a matter of mere routine.
- To get quantitative Estimates of all materials required-from your Engineers,-is, likewise a matter of routine.
- BUT – to procure IN TIME – the STEEL required to specification is quite another matter ! !
- Why not contact the right people, who have the organisation AND the stocks, AND THE EXPERIENCE – to help you ?

TATA SCOB DEALERS
(CONTROLLED STOCK)
CALCUTTA LIMITED
20, STRAND ROAD, CALCUTTA-1
TEL :- 22-1101 (9 LINES)

LACS

অটুট বন্ধুত্ব

যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়। এই সাইকেলের বেলাতেই দেখুন না!

র‍্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত এই সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

র‍্যালে

বিশ্ববিখ্যাত

বাইসাইকেল

SRC-59 BEN

লিপটন **LAOJEE** লাওজী চা

LLC-6 BEN

লাওজী চা **LAOJEE** কম দামে সেরা চা

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি আমাদের পাথেয় হউক

"কঠোর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাঁদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধানচন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

উপচীয়মান উপহার

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে,' পর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

made *Exclusively* by **KOLAY**

first time in India

LEMON PUFFS

Distinctive Quality

Available in Air Tight Cartons and in Special Tins

Quality BISCUITS & CONFECTIONERY

KOLAY

KOLAY BISCUIT CO. PVT. LTD. CALCUTTA 10

স্নিগ্ধ আনন্দঘন দিনের স্বপ্ন সত্যি হোক

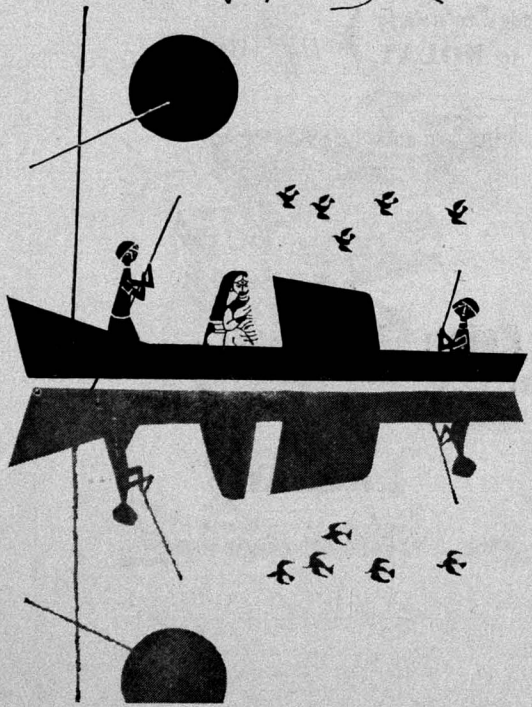

আকাশের আগুন-জলা রোষ দেখেছিলে —খাল বিল সব শুষে নিল, মাঠের এক কণা সবুজও অবশিষ্ট রাখল না। সেই খ্যাপা আকাশের মুখে আবার কে কালি লেপে দিল— শ্রাবণের বুকে এত কান্না ছিল কে জান্‌ত? এবার দেখো তো, পেঁজা তুলোর মেঘে একাকার আকাশ, মধুমতী নদীর বুকে ছায়াটিও কাঁপেনা! শরৎ এসেছে! সঙ্গে নিয়ে এসেছে স্নিগ্ধ, আনন্দ-ঘন দিনের স্বপ্ন। ঘরে ঘরে সেই স্বপ্ন সত্যি হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

সূর্য নামে অস্তাচলে।
পাটরাণী বসলেন রূপসজ্জায়।
আকাশের অনন্ত পটভূমি। অসংখ্য তারকা।

পাটরাণী স্মিত হাসলেন।
প্রীত সখীবৃন্দ হোল কেশবিন্যাসে অগ্রসর।
কুঞ্চিত কুন্তলদামে চন্দ্রকলা।
বিচ্ছুরিত হোল সোনালী পর্যবর্ণ দ্যুতি।
দ্যুতিময়ী সুন্দরী পাটরাণী ভারত জননীর সঙ্গেই যেন তুলনীয়।

ভারত জুট মিলস্‌ লিমিটেড
দাশনগর।

করপুটে লীলাকমল যাদের
কালো কেশে গাঁথা কুন্দ কচি।
লোধ্র পরাগ স্মিতমুখে যেথা
পাণ্ডু কান্তি দিয়েছে রচি।
—কালিদাস

ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ ফুলদলের মতো বিকশিত করে নারীর সৌন্দর্য্য। যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীরা কেশ বিন্যাসের জন্য **অলিভ অয়েল** মেখে আসছেন। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল **ক্যান্থারলে** আছে কেশের পক্ষে হিতকারী বিশুদ্ধ সেই **অলিভ অয়েল**। তাই আজও আধুনিকারা পরম আগ্রহে এই কেশ তৈল ব্যবহার করেন।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

CC. K-3

"অকালে বোধন করি   পূজ দেবী মহেশ্বরী
তরিবে হে দুঃখ পারাবার

*   *   *   *

শ্রীরাম আপনি কয়   বসন্ত শুদ্ধি সময়
শরৎ অকাল এ পূজার

*   *   *   *

বিধাতা কহেন সার   শুন বিধি দিই তার
কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন

*   *   *   *

পূজি দুর্গা রঘুপতি   করিলেন স্তুতি-নতি
বিরচিল চণ্ডীপূজা গান।

তুমি দয়াবতী মাতা শুনেছি পুরাণে
তুমি শক্তি মুক্তি তৃপ্তি তুমি পরিত্রাণে
নানাগুণে ব্যক্ত আছ এ তিন ভুবনে
রূপগুণে অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে
যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ
মোদের নাহিক আর ডাকিবার লোক
কৃপাবলম্বন করি নিবারহ শোক।

এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

ডিজাল ইঞ্জিনস্ এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং লিমিটেড

এয়ার সার্ভে কোং অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

৩১ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

কেশের
পরিচর্যায়
রূপ
হয়ে ওঠে
অপরূপ

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলে ক্যান্থারিস্ ফ্লাইএর এক্সট্রাকট্ থাকায় কেশমূল সজীব ও সুপুষ্ট রেখে নিবিড় কেশোদ্গমের সাহায্য করে ও চুল ওঠা বন্ধ করে। এই অতুলনীয় সুগন্ধি কেশ তৈল ব্যবহারে কেশগুচ্ছ সুচিক্কণ, ঘন ও দীর্ঘ হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

ফুলের মতো
স্নিগ্ধ-সুষমায়
ঘিরে রাখবে

মন মাতানো সুগন্ধি **প্রিয়া**—মাত্র কয়েক ফোঁটাতেই আপনাকে স্বপ্নবিভোর করে তুলবে, মনে জাগাবে কতদিনের কত পুরান সুখ-স্মৃতি। দারুণ গ্রীষ্মেও **প্রিয়া** আপনাকে সারাদিন ফুলের মত স্নিগ্ধ রাখবে।

প্রিয়া স্নো মেখে তার ওপর উর্বশী ফেস পাউডার মাখলে প্রসাধন নিখুঁত থাকে। মৃদু সুগন্ধে ভরা এই অপূর্ব্ব স্নো ত্বক মসৃণ ও কোমল রাখে, অল্পবয়সের মুখের ব্রণ, দাগ ও বার্ধক্যের মুখের কোঁচকান রেখা দূর করে।

প্রিয়া সেণ্ট ও স্নো
দিনভোর আপনাকে স্নিগ্ধ ও সুন্দর রাখবে…

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ
২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

নৃত্য-পরা মণিপুর, শৌর্য-ভরা জয়পুর অথবা স্বপ্ন-মাখা কোনারক —মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো আই-এ-সি সর্বত্রই আপনাকে সত্বর পৌঁছে দেবে। এই ভাবেই সে বিশাল ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে আপনাকে নিরন্তর সাহায্য করছে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

IAC-48 BEN

DESIGNED

The Kuljian Corporation of India is a service organisation specialising in consulting engineering. ■ In its fully—equipped office in Calcutta, the Corporation has assembled a well-knit team of about a hundred trained Indian and American construction engineers and draughtsmen all qualified by experience in project construction. ■ Backed by the experience of a decade in power engineering in India and proud of the tradition of its American collaborators whose famous name it bears, the Corporation welcomes exacting assignments of all types, in any part of India, any time. ■ From feasibility report to initial operation is the scope of Kuljian service ; from power plants to all-type public works is the range of Kuljian operation.

SURVEY
REPORT
DESIGN
ENGINEERING
PROCUREMENT
CONSTRUCTION
INSPECTION
INITIAL OPERATION

The **Kuljian** *Corporation*
(INDIA) PVT. LTD.
ENGINEERS · CONSTRUCTORS
24-B, Park Street, Calcutta 16

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

FOR SERVICE

With
the
Compliments of

DRAWING & SURVEY INSTRUMENTS
G. C. Laha PRIVATE LIMITED
LEADING ARTISTS' COLOURMEN
PAINTS
1 DHARUMTOLA St.
CALCUTTA-13

দীপ্তি-আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন স্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।
'দীপ্তি' মার্কা এনামেলের বাসন অল্পদিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

KALPANA.27.B.8

ঢেঁকিছাঁটা চাল

বিশেষজ্ঞদের মতে কলে ধান ভান্‌লে ১৫ ভাগ প্রোটিন ৮০ ভাগ স্নেহ পদার্থ ৫০।৬০ ভাগ খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। এর ফলে, এই চালের ভাত খেলে দেহের পুষ্টিসাধন ব্যাহত হয়ে থাকে।

এ ছাড়াও : ঢেঁকিছাঁটা চাল খেলে………গ্রামের অসংখ্য বেকার ও অর্ধবেকার লোকের কর্মসংস্থানে সাহায্য হয়।

দেশের গ্রামকে যাঁরা ভালবাসেন, গ্রামীণ মানুষের জন্য যাঁদের বেদনা আছে, তাঁরা যেন ঢেঁকিছাঁটা চাল ব্যবহার করেন।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষৎ কর্তৃক প্রচারিত

ভারতীয় রেলওয়ের আদিপর্ব

পূর্ব রেলওয়ের প্রথম যাত্রীবাহী এঞ্জিন "এক্সপ্রেস"

প্রথম যুগে বার্ন কোম্পানির প্রধান কারবার ছিল গৃহ-নির্মাণ এবং আসবাবপত্র তৈরি। ১৮২৯ সালে জন গ্রে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার পর থেকেই এঞ্জিনীয়ারিং, লোহাঢালাই, ঠিকাদারি ইত্যাদি নানা শাখায় প্রসারিত হয়ে বার্ন কোম্পানির কারবার বেশ ফলাও হয়ে ওঠে। জন গ্রে-ই ভারতের প্রথম রেলওয়ে ঠিকাদার। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জন্য গ্রে একশো মাইল রেলপথ স্থাপন করেন। গ্রে-র এই কৃতিত্বে বার্ন কোম্পানির প্রচুর সুখ্যাতি এবং আর্থিক লাভ হয়। এই লভ্যাংশ দিয়েই হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে একটি ঢালাই কারখানা স্থাপিত হয়। হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির বর্তমান বিরাট কারখানার এই হল গোড়াপত্তন।

মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বার্ন কোম্পানির হাওড়ার এই কারখানায় তৈরী নানা জিনিসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় রেলওয়ের জন্য নির্মিত বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং সরঞ্জাম। ১৯০৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বার্ন কোম্পানি থেকে ৫৮০০০-এরও বেশী শতাধিক বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং ১,১২০০০-এরও বেশী ক্রসিং ও সুইচ্‌ দ্রুত প্রসারমান ভারতীয় রেলওয়েকে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, বড় বড় নদীর উপরে রেলওয়ে ব্রিজ্‌ তৈরি করার জন্য হাজার হাজার টন ইস্পাতের কাঠামো বার্ন কোম্পানির স্ট্রাকচারাল বিভাগ সরবরাহ করেছে।

mb

মার্টিন বার্ন লিমিটেড

মার্টিন বার্ন হাউস,
১২ মিশন রো, কলিকাতা ১

শাখা : নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

MBGC-16A BEN

ফিলিপ্‌স উৎসবের আনন্দ বাড়ায়

PHILIPS ফিলিপ্‌স

বাংলার ও বস্ত্র শিল্পের লক্ষ্মী

বঙ্গলক্ষ্মী

মাতৃপূজার ও নিত্য প্রয়োজনে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি, লংক্লথ, শাড়ী, অপরিহার্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্‌ লিঃ

হেড অফিস : ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

স্মরণীয় ৭ই এ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

আমাদের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

'রবীন্দ্রজীবনী'-কার
শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের
রবি-কথা ৩·৫০

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের
কবি-প্রণাম ৫·০০
[কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কাব্য-সংকলন]

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র কথা ২·০০

কানাই সামন্তের
গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ
রবীন্দ্র প্রতিভা ১০·০০

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০

কাজী আবদুল ওদুদের
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২·০০
[গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ]

আরো কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বিবিধ গ্রন্থ

প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুরের
অবনীন্দ্র চরিতম্ ৫·০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা ৪·০০

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর
পুরাতনী ৫·০০

শান্তিদেব ঘোষের
গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য ৩·০০
[বহু চিত্র-সম্বলিত]

দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের
আত্মজীবনচরিত ৩·০০

ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের
ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৫·৫০

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের
বাংলা কাব্যে শিব ১০·০০

শ্যামাপদ চক্রবর্তীর
অলঙ্কার চন্দ্রিকা ৭·০০
[৩য় সংস্করণ]

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের
বঙ্কিমচন্দ্র ৫·০০

নলিনী কুমার ভদ্রের
বিচিত্র মণিপুর ৩·০০
[মণিপুরের সর্বাঙ্গীন পরিচিতি]

প্রাণতোষ ঘটকের
রত্নমালা (সমার্থাভিধান) ২·৫০
[Dictionary of Synonyms]

বিমলচন্দ্র সিংহের
বিশ্বপথিক বাঙালী ৫·০০

শ্রীদিলীপ কুমার রায় সংকলিত
দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ন ৮·০০
[দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, গান ও কাব্য-নাট্যের নানা দৃশ্য]

স্মৃতিচারণ (১ম খণ্ড) ১২·০০
স্মৃতিচারণ (২য় খণ্ড) ৬·৫০
[প্রথম খণ্ডে আছে দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, কৃষ্ণপ্রেম, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রোমা রোলাঁ প্রভৃতি ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণের বৃত্তান্ত]

সুধীর চন্দ্র সরকারের
বিবিধার্থ অভিধান ৬·৫০
[বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব অভিধান। প্রায় পনর হাজার শব্দের সমন্বয়ে গ্রথিত]

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহের
আকাশ ও পৃথিবী ১০·০০

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রায় ৩০০ বছর আগেকার কথা। বিজাপুরের গোল গম্বুজে একদিন পদার্পণ করলেন সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহ্। সঙ্গে তাঁর নর্মসহচরী রূপসী রম্ভা। এই গোল গম্বুজের প্রতিধ্বনি তোলার বিচিত্র ক্ষমতাকে পরীক্ষা করে দেখাই তাঁদের উদ্দেশ্য। সোপান শ্রেণী অতিক্রম ক'রে উঠতে উঠতে রম্ভাকে মাঝপথে রেখে একেবারে শীর্ষদেশে উঠে গেলেন আদিল শাহ্। ... "আমাকে তুমি কি সত্যি ভালবাস, রম্ভা?" মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন সুলতান। মেঘমন্দ্র প্রতিধ্বনি তুলে সে শব্দ-তরঙ্গ ভেসে এল তাঁর প্রিয়তমার কানে। "সত্যিই ভালবাসি, হজরত"—রম্ভার কোকিল-কণ্ঠ বহুক্ষণ ধরে ঝংকার তুলে ফিরল। "তোমার প্রাণের চেয়েও বেশী?" ধীরস্বরে বললেন আদিল শাহ্। "আপনি কি আমার প্রেমে সন্দেহ করেন, জাহাঁপনা?" শঙ্কিত আবেগে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে রম্ভার কণ্ঠ। কৌতুকে নেচে উঠল সুলতানের দু'টি চোখ। কপট গাম্ভীর্যে বললেন, "না হলে প্রশ্ন করব কেন?" বজ্রনির্ঘোষের মতো সে ধ্বনি বিমূঢ় করে দিল রম্ভাকে। অকস্মাৎ বাতাসে ভেসে উঠল শুধু রেশমী কাপড়ের খসখস শব্দ আর ... আর পরক্ষণেই অলিন্দ থেকে নীচে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রূপসী রম্ভা।...

অতীতের এই করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে আপনি যখন গোল গম্বুজে এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকার সমাধির উপরের তল দিয়ে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে যাবেন তখন আপনার মৃদু চরণধ্বনি মেঘডম্বরের ন্যায় প্রতিধ্বনি তুলবে। ... আমাদের এই বিশাল দেশে মোটরগাড়িতে ভ্রমণের অন্যতম সুখ হ'ল অসংখ্য পুরাকাহিনী ও লৌকিক উপাখ্যান শোনার অপূর্ব সুযোগ আর অজানাকে আবিষ্কার করার অনাবিল আনন্দ।

ডানলপ ভারতে টায়ার শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা

DC-580 BEN

কেবলমাত্র স্তম্ভপৃষ্ঠ ও প্রাচীরগাত্রের শিল্পকলাই নহে—
সুষ্ঠু স্যানিটারী ব্যবস্থা ও গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্যবোধের
অন্যতম প্রতীক

কুমারস্ স্যানিটারী এম্পোরিয়াম্

দীর্ঘদিন সুনামের সহিত স্যানিটারী প্লাম্বিং ও টিউবওয়েল
ব্যবসায়ে নিয়োজিত

১৩৮, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১২২৩ গ্রাম : কুমারস্যানিট

৺পূজার বাজারে শ্রেষ্ঠ পণ্য

ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার রেশম ও অন্যান্য কুটীরশিল্প !

পরিবেশক—

পশ্চিমবঙ্গ
রেশমশিল্পী সমবায় মহাসঙ্ঘ লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায়—খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন অনুমোদিত

১২।১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

বিক্রয় ভাণ্ডার

- ১২।১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১
- কুটীরশিল্প বিপণি—১১এ, এসপ্ল্যানেড্ ইস্ট, কলিকাতা - ১
- ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭
- ১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা - ২৯
- নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৪

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ও ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

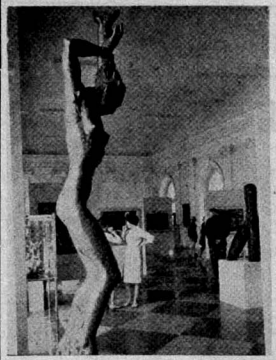

জার্ম্মানীর চারুকলা সম্বন্ধে আরও
জানতে হলে

জার্ম্মান নিউজ উইক্‌লি

(German News Weekly)

পড়ুন

পশ্চিম বেলিনের চারুকলা প্রদর্শনী
'বেলিন—শিল্পের স্বাধীনতার পীঠস্থান'
সমস্ত রাজনৈতিক সংঘাতের ঊর্ধে এই শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু সাংস্কৃতিক জীবনধারার নিদর্শন।

গ্রাহক সংক্রান্ত ব্যাপারে পত্রালাপের ঠিকানা
The Press and Information Office of the Embassy of the Federal Republic of Germany
6, Shanti Path, Chanakyapuri, New Delhi.

সুন্দরম্
আগামী দেওয়ালিতে
রাষ্ট্রভাষায় একটি বিরাট য়্যালবম-এর ন্যায়
প্রকাশিত হবে
অজস্র রঙিন ছবি অজস্র এক রংয়া ছবিতে
অপূর্ব হবে এই সংখ্যা
মূল্য দুই টাকা
এজেণ্টরা অবিলম্বে যোগাযোগ করুন
৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স। ৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা - ১৩
ফোন : ২৩৯৭৭৭

অকাল বোধন

রামায়ণে বর্ণিত আছে, রাবণের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী অম্বিকা নিজেই রাবণের রথে বসলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীকে দেখে বিস্মিত রাম ধনুর্বাণ ফেলে দেবীকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করলেন। রাবণবধ অসম্ভব, একথা ভেবে শুধু রামচন্দ্র নন, দেবতারাও বিষণ্ণ হলেন। তখন,

বিধাতারে কহিলেন সহস্রলোচন।
উপায় করহ বিধি যা হয় এখন॥
বিধি কন, বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে।
হইবে রাবণ-বধ অকাল-বোধনে॥

প্রচলিত প্রথা অনুসারে বসন্তকালই দেবী-পূজার শুদ্ধি সময়। বিধাতা নিজেই শ্রীরামচন্দ্রের সন্দেহ নিরসন করলেন, শরৎকালে ষষ্ঠী কল্পেতে বোধনের নির্দেশ দিয়ে। 'বনপুষ্প ফলমূল দিয়ে' সাগরের তীরে শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডীপাঠ সমাপন করে দুর্গোৎসব আরম্ভ করলেন।
—সেই থেকে ভারতের ঘরে ঘরে শরৎকালে আগমনীর সুর বেজে উঠল!

কে, সি, দাস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা
আবিষ্কারক : রসোমালাই

পূজোয় চাই নতুন জুতো
Bata

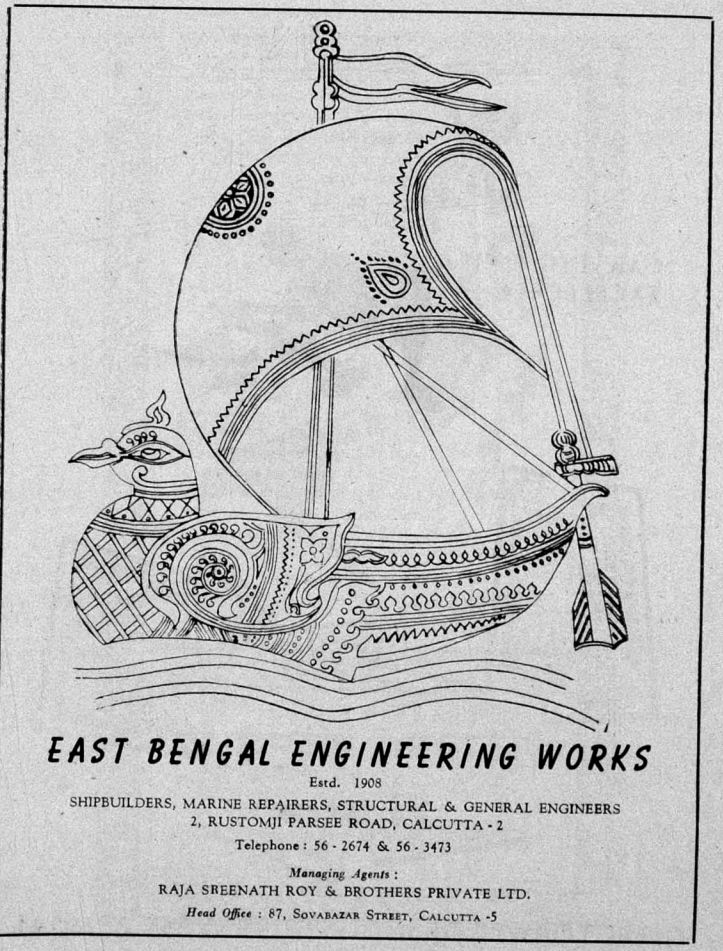
EAST BENGAL ENGINEERING WORKS
Estd. 1908
SHIPBUILDERS, MARINE REPAIRERS, STRUCTURAL & GENERAL ENGINEERS
2, RUSTOMJI PARSEE ROAD, CALCUTTA - 2
Telephone : 56 - 2674 & 56 - 3473
Managing Agents :
RAJA SREENATH ROY & BROTHERS PRIVATE LTD.
Head Office : 87, SOVABAZAR STREET, CALCUTTA -5

How the ivory worker plies his chisel to carve out intricate designs leaves one in admiring amazement. With a few simple implements like chisel, files and knives, the 'BHASKARS' — the traditional ivory Carvers of West Bengal produce things of rapturous beauty and rare excellence.

CARVING FOR EXCELLENCE

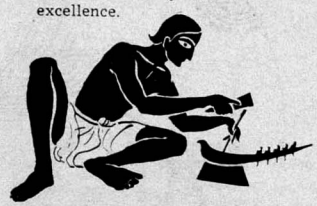

Cost what they may, ivory carvings are ideal objects for gifts and presents and perhaps no home with a taste for art and beauty is complete without the possession of a wonderful work of West Bengal ivory.

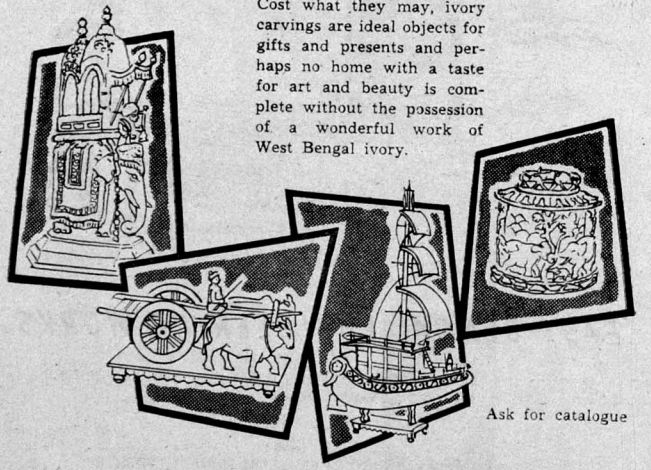

Ask for catalogue

DIRECTORATE OF INDUSTRIES, WEST BENGAL

1, HASTINGS STREET (9TH. FLOOR), NEW SECRETARIAT, CALCUTTA-1.

CHITRAKARU

সপ্তম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। তেরশো উনসত্তর। | সুন্দরম্। আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। পঞ্চম খণ্ড।

এই সমস্ত সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক দরদ, ঐকান্তিক সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া সুন্দরম্-এর এই সপ্তম বর্ষে পদার্পণ সম্ভব হোত না। নতমস্তকে সুন্দরম্ এঁদের দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার কোরছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রী কে, ডি, রায়।
শ্রদ্ধেয় শ্রী কে, কে, রায়।
শ্রদ্ধেয় শ্রী বি, কে, দত্ত।
শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীবলিন ঘোষ।
শ্রদ্ধেয় শ্রীসারদা চরণ পাল।
শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ভারতলক্ষ্মী মুখার্জী।
শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিতাভ ব্যানার্জী।

বন্ধুবর শ্রীশঙ্করজিৎ সেন।
বন্ধুবর শ্রী বি, কে, রায়।
বন্ধুবর শ্রীজ্যোতিষ গুপ্ত।
বন্ধুবর শ্রীঅশোক মুখার্জী।
বন্ধুবর শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী।
বন্ধুবর শ্রীরমেন আরন দত্ত।
শ্রীমতী হিমোলা আরন দত্ত।

সূচীপত্র

সুভো ঠাকুর উবাচ

শ্রীঅরবিন্দ লিখিত
ভারতীয় ভাস্কর্যের তাৎপর্য
অনুবাদ : শিশিরকুমার ঘোষ

দুর্গাদাস সরকার
কবিতা

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
ভাস্কর্য

অসিতকুমার হালদার
ভাস্কর্যকলা

শঙ্কর দাশগুপ্ত
ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী

শৈলশেখর মিত্র
কবিতা

বিশেষ প্রতিনিধি
ভাস্কর কারমারকর

রাণা বসু
ভাস্কর পরিচিতি : প্রমথ মল্লিক

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা
খবরাখবর

লেখক পরিচিতি

শিশিরকুমার ঘোষ

শান্তিনিকেতনের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন কিছু-কাল। বর্তমানে অবস্থান কোরছেন আর্জেন্টিনায়। শ্রীঅরবিন্দ-র অধ্যাত্ম মানসের অভিজ্ঞতালব্ধ শিল্প-বিষয়ক ইংরাজী নিবন্ধাদির অনুবাদকর্মের জন্য শিশিরবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। ইতি-পূর্বে সুন্দরম্-এ প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ লিখিত ও শিশিরবাবু অনূদিত শিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধটি স্মর্তব্য। 'রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্য'—সাম্প্রতিককালের এই উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থের গ্রন্থকার তিনি।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ভারতীয় ভাস্কর্যের মহান ঐতিহ্যমূলক ইতিহাসের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম তালিকাভুক্ত হবার দাবীদার তিনি হোচ্ছেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। সাহিত্যশিল্পও দেবীপ্রসাদের কুশলী কলমের স্বাক্ষর-চিহ্নিত। শোনা যাচ্ছে, তিনি সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি নির্মাণে রত। সুন্দরম্-এর এই সংখ্যায় প্রকাশিত ভাস্কর্যবিষয়ে তাঁর বক্তব্য নানাকারণে অনুধাবনীয়।

অসিতকুমার হালদার

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের প্রধানতম শিষ্যদের একজন। শান্তি-নিকেতনের কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ নন কেবলমাত্র, তার গোড়া-পত্তন হয় তাঁর হাতেই। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যধন্য। ভারতীয় চিত্র-কলা ও ভাস্কর্য তাঁর অবদানে উজ্জ্বল। সুলেখক। বহু গ্রন্থের প্রণেতা। সম্প্রতি শিল্প-সম্পর্কে একটি বৃহৎ গ্রন্থ-রচনায় ব্যাপৃত।

শঙ্কর দাশগুপ্ত

শিল্পকলা-বিষয়ক প্রবন্ধাদির রচনাকার। ভারতীয় ভাস্কর্য-কলার ইতিহাসে হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর অম্লান অবদান স্মরণ কোরিয়ে ও তাঁর পরিচিতি লিপিবদ্ধ কোরে তিনি পাঠক-সমাজের সুনিশ্চিত ধন্যবাদভাজন।

রাণা বসু

সুলেখক। ইতিপূর্বে সুন্দরম্-এ সুকুমার কলা ও ভাস্কর্য বিষয়ে প্রবন্ধাদি রচনা কোরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন। প্রমথ মল্লিক—এই স্বনামধন্য জীবিত ভাস্করের নাম আমাদের স্মৃতি হোতে অবলুপ্ত-প্রায়। এঁর জীবনী ও কর্মের আলোচনার দ্বারা রাণা বসু একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম-সম্পাদনের অধিকারী।

সুভো ঠাকুর উবাচ

বাংলা-সংস্কৃতির ইন্টক-পর্বের পটভূমিকায় সুন্দরম্।

সিনেমা, চানাচুরি-সাহিত্য এবং সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার ইন্টকমার্কা পত্র-পত্রিকার যুগে সুন্দরম্ বাংলা-সংস্কৃতির—অন্ততপক্ষে একটি দিকের তো বটেই—পতাকা গত ছ-বছর বহন কোরে আজ সাত বছরে পড়লো।

সুভো ঠাকুরের সনির্বন্ধ অনুরোধ যাঁরা খেলো সিনেমা, সাহিত্য এবং শিল্প একাকার কোরে ভালো-মন্দ বালাই বর্জিত শস্তায় কিস্তিমাত করেন এবং সাংস্কৃতিক বনতে চান—সে-রকম পণ্ডিতরা দয়া কোরে যেন সুন্দরম্ না পড়েন। সুন্দরম্ সাময়িক পত্রিকা মহলে নব্যবাংলার পঞ্চাশ-হাজারি মনসবদার হোতে চায় না—এই ওর বক্তব্য।

সুন্দরম্ সিনেমাকে একটি উচ্চস্তরের শিল্প হিসাবে নিশ্চিত মনে করে। সেই শিল্পে যে-সমস্ত শিল্পীরা নিজেদের উৎসর্গ কোরেছেন তাঁদের সুভো ঠাকুর উঁচু-স্তরের আদর্শ কলাকার হিসাবে সম্মানিত কোরতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু কোন্ চিত্রাভিনেত্রী মাত্র তোয়ালে সম্বল কোরে কলঘরের দিকে রওনা হোচ্ছেন, কোন্ সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রী ডাবের জল অথবা অন্য কোনো জল পান কোরছেন, কিম্বা কোন্ চিত্র-তারকা কলা 'খাই-খাই' উদ্যত—এই সমস্ত চিত্র ও তার টিপ্পনি-সহ পরিচিতির সঙ্গে উচ্চস্তরের সিনেমা শিল্পাদর্শের কি সম্বন্ধ তা শিক্ষিত সর্ব-সাধারণের বিচার-বুদ্ধির উপরই সুভো ঠাকুর আপাতত ন্যস্ত কোরতে চায়।

সত্যজিৎ রায়, রাজেন তরফদার, মৃণাল সেন ইত্যাদি-দের মতো সার্থক সিনেমা-রচয়িতারা কলালক্ষ্মীর মন্দিরে সুন্দরের আরাধনায় প্রদীপ রাখার স্ব স্ব বৃহৎ বা নাতিবৃহৎ কুলুঙ্গি রচনায় অবশ্যই সমর্থ—এ-কথা কে অস্বীকার কোরবে? সুন্দরম্-এর বক্তব্য : সিনেমা-চিত্র-রচয়িতা এবং অভিনেতা অভিনেত্রী হিসাবে সত্যিকারের সাধক যাঁরা তাঁদের প্রতি সুন্দরম্-এর সম্ভ্রম—তুলনায় শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলাদণ্ডে সুনিশ্চিত সমান ওজনের। কিন্তু আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ দেখা যাচ্ছে যে, সত্যিকারের উঁচুস্তরের শিল্পের পরিবর্তে চাতুর্যমণ্ডিত চানা-চুরি

শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা তথা সংস্কৃতির পক্ষপাতী। কোনো জিনিসের গুরুত্বের গুরুভার বহন কোরতে নিতান্তই না-পারগ তাঁরা। চিন্তা করার শক্তি তাঁদের চিত্ত হোতে অবলুপ্ত-প্রায়। সুসংযত মননশক্তি নিঃশেষে মুছে যেতে চলেছে যেন এ-দেশ থেকে।

সুন্দরম্ এই পটভূমিকায় গত ছ-বছর পেরিয়ে আসতে গিয়ে ঋণে ক্ষত-বিক্ষত হোলেও সে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এবং এগিয়ে চলতে বদ্ধপরিকর। অবশ্য, এর জন্যে যা কিছু কৃতিত্ব, সুভো ঠাকুর বলে, তা সবই ওর শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু-বান্ধবের দাক্ষিণ্য, সাহায্য ও সহানুভূতির দৌলতেই সম্ভব হোয়েছে। সুন্দরম্‌কে সংস্কৃতির বাহক হিসাবে সফলকাম হোতে সাহায্য করার জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে পুনর্বার ও' মাথা নত কোরছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আম-দরবারে সুন্দরম্-এর আবেদন।

আমাদের কেবলমাত্র ঐকান্তিক শ্রদ্ধারই নয় ভালবাসারও পাত্র মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সামান্য কিছুদিনের মধ্যে সর্ববিষয় যে অসামান্য দরদী-দৃষ্টিভঙ্গী-সহকারে ছোট বড়ো নানা সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট এবং আংশিক সফলকামও বটে। তাতে, এই জনপদের জনগণ তাঁর প্রতি অচিরাৎ অশেষ আস্থাবান হোতে বাধ্য। তাঁর জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা যেমন সহজ তেমনি অমোঘ সারল্যে শক্তিশালী। তাঁর আন্তরিক সততা অতুলনীয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন সমস্যাসংকুল বাংলাদেশের সর্বোময় আশার আলো তিনি।

বাংলার সংস্কৃতির সবচেয়ে হতাদরে এবং অবহেলায় লালিত যে বিভাগ তার নাম ললিতকলা। আজ বাংলা দেশের এই ললিতকলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনাচার অনুপ্রবেশ-পূর্বক এর পূর্বকালীন গৌরবকে ধূলাবলুণ্ঠিত কোরতে সমুদ্যত। সেই কারণে সুন্দরম্-এর পক্ষ থেকে সুভো ঠাকুর তাঁর 'আম-দরবারে' বাংলার একজন সামান্যতম দলাদলি-বহির্ভূত শিল্পী হিসাবে আবেদন জানাচ্ছে—শিল্পীদের প্রতি এবং দেশজ শিল্প-সংস্থার প্রতি তাঁর সৎ, সবল, সাহসী দৃষ্টি যেন বারেকের তরেও পতিত হয়।

সুভো ঠাকুর সামান্যতম সাধারণ অজ্ঞ নাগরিক হিসাবে বুঝতে অক্ষম কি কারণে স্বনামধন্য শিল্পী কোলকাতার আর্ট কলেজ-এর অধ্যক্ষকে তাঁর কর্ম হোতে

বিচ্ছিন্ন কোরে অন্যত্র স্থাপিত ও স্থানান্তরিত করা হোল? এর ফলে শিল্পী চিন্তামনি কর বর্ষাধিককাল বেতন হোতে বঞ্চিত। ছাত্ররা বর্ষাধিককাল বেতন দিয়েও তাঁর মতো উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষা হোতে প্রবঞ্চিত।

কি হিসাবে, কোন ন্যায়সঙ্গত আইন অনুযায়ী, মানবধর্মের কোন নিয়ম মারফৎ তাঁর বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আনিত সকল অভিযোগ সরকার কর্তৃক অনুসন্ধানে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পরেও এবং সসম্মানে তিনি মুক্ত হোয়েও কেন তাঁর এই শাস্তি, এই অপমান ও লাঞ্ছনা? শোনা যায়, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের সম্মান অথবা দলাদলি বজায় রাখতে গিয়েই নাকি নিরীহ শিল্পীর এই নাস্তানাবুদ অবস্থা।

শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিকট সুভো ঠাকুরের এইটুকু শুধু জিজ্ঞাস্য—'সম্মান' শব্দটি কি শুধু রাইটার্স বিল্ডিং তথা কলমচি কোঠার প্রাকারেই কবলিত? সাধারণ মানুষের কি সম্মানের কোনো বালাই নেই? রবীন্দ্রনাথের বজ্রকঠিন বাণী বুদ্ধিজীবী বাঙালী মাত্রেই আজো স্মরণ রাখে 'যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'।

বাংলার সমস্যা-সংকুল অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে সর্বোময় আশার আলো মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিকট সামান্য নাগরিক হিসাবে, সামান্যতম শিল্পী হিসাবে সুভো ঠাকুর এই যাচ্ঞা করে—বাংলার শিল্পীদের সকল লাঞ্ছনা, অবমাননা হোতে উদ্ধার কোরে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন তাঁদের পূর্ববৎ সম্মানের আসনে। দৃষ্টান্ত রেখে যান আগামীকালের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের সুদূর প্রসারিত পাতায়।

মডার্ণ আর্ট গ্যালারীর পারচেজ কমিটির সম্মুখে শিল্পীরা কিউরিও ডিলারের অধম পেডলারের সামিল।

কয়েকদিন আগে কোলকাতায় বহু-বিজ্ঞাপিত আধুনিক শিল্পের পারচেজ কমিটি বা ক্রয়-সংস্থার সভা বোসেছিল। এ-ব্যাপারে সুন্দরম্-এর সুনিশ্চিত মতামত ব্যক্ত করা কর্তব্য মনে হওয়ায় সুভো ঠাকুর বলে যে, চিত্র, ভাস্কর্য তথা ললিতকলা ক্রয়ের সরকার কর্তৃক উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন শিল্পীদের পক্ষে অত্যন্ত হেয় ও অপমানজনক। শিল্পীরা বিচিত্র বস্তুর ব্যবসায়ী তথা কিউরিও ডিলার নয়—একথা স্বাধীন

সরকারের সংস্কৃতি-দপ্তর স্মরণ রাখলেই বোধহয় ভালো হোত, বিশেষ কোরে যেখানে হুমায়ুন কবীরের মতো সংস্কৃতিবান গুণী ব্যক্তি মন্ত্রীত্বের সিংহাসন অলংকৃত কোরে আছেন। কিন্তু এই আর্ট পারচেজিং কমিটির কাছে শিল্পীদের অবস্থা—নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বলেন, বিচিত্র বস্তুর বিক্রেতা তথা কিউরিও ডিলার হোতেও অধম পেড্‌লার বা ফিরিওয়ালার সামিল। সেই-কারণে সত্যিকারের উপযুক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ স্বাধীনচেতা স্বনামধন্য শিল্পীরা অর্থাভাবে আত্মহত্যা কোরলেও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই ফিরিওয়ালার আসন অলংকৃত কোরতে অসমর্থ।

শোনা গেল, বিজ্ঞাপিত স্থানে এই সমস্ত চিত্র এবং আধুনিক শিল্পবস্তু ক্রয়-অন্তে অন্যান্য স্থানে গিয়েও বহু চিত্র ক্রয় কোরেছেন পারচেজ-কমিটি। এটা, কি নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা কোরেছেন তা আমরা জানতে উৎসুক। কারণ সেই নিয়ম অনুযায়ী সুন্দরম্ কার্যালয়ে অথবা অন্যান্য কেন্দ্রেও অন্যান্য অনেকেই ক্রয়-সংস্থার সদস্যকে বহু ভালো আধুনিক চিত্রের সমাবেশ দর্শনের জন্য আহ্বান জানাতে পারতো।

শুধু তাই নয়, শোনা গেল সবে শিক্ষা-সমাপনান্তে যে-সমস্ত তরুণ শিল্পীরা বিদেশী কনসুলেটের অঙ্গীভূত 'আলিয়াস ফ্রাসেস' নামক স্থানে একটি প্রদর্শনী কোরেছিলেন—আমাদের উদার-হৃদয় ক্রয়-সংস্থার সভ্যবৃন্দ বিশিষ্ট বণিক-গৃহিণীর অঞ্চল তাড়িত হোয়ে—সেখানে গিয়েও ছবি ক্রয় কোরে সত্যিকারের ধনিক-দরদী হিসাবে প্রমাণিত কোরেছেন নিজেদের।

সুন্দরম্-এর ধারণা ছিল—ভারতের মডার্ণ আর্ট গ্যালারির সুমহান নাম আধুনিক শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত যাঁরা—কেবলমাত্র সেই সব শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সংরক্ষণের জন্যই বুঝি-বা নির্ধারিত।

মডার্ণ আর্ট গ্যালারী নিতান্ত বালকবীরদের ঐশ্বর্য-মণ্ডিত না হয় যাতে সে-কারণে এই সকল ক্রয়-সংস্থার প্রতি ললিতকলা অ্যাকাদমির সজাগ দৃষ্টি থাকা কর্তব্য। এ-সম্পর্কে সুন্দরম্ সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের আর এক দফা দৃষ্টি আকর্ষণ কোরছে।

যে নিয়মে প্রকৃতির সৃজনক্রিয়া চলল, সেই নিয়মের অনুরূপ পথ ধরে চলল মানুষের সৃষ্টি-কার্য। এই কারণেই ঋষিরা বললেন মানবশিল্পকে—'দেবশিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পং অধিগম্যতে' … 'দেবশিল্পানামনুকৃতিহ'রিইলোকে!' সৃষ্টি রচনা ধরে মানুষের মন রচয়িতার পরিচয় পাচ্ছে, মানুষের শিল্পসৃষ্টির বেলাতেও এই নিয়ম খাটল। প্রদর্শকের পরিচয় নিচ্ছে দর্শক শিল্প-রচনার মধ্য দিয়ে। আর্টের রাঙানো পট—প্রভাতের আকাশ সন্ধ্যার আকাশ যেন ছন্দে দুলছে, এরই ওপারে প্রদর্শক, এপারে দর্শক, মাঝে শিল্প-রচনা। এদিকে রইল বাগানের মালি, ওদিকে রইল বাগানের মালিক, মাঝে রইল ফুলের তোড়া, ফুলের মালা নানা কৌশলে গাঁথা। এই হল রস-সৃষ্টি ও তার উপভোগের লীলা খেলা।

আর্টকে পেতে তপস্যা, আর্টকে বুঝতে তপস্যা, কারিগরির তপস্যা সমঝদারের তপস্যা। এই তপস্যার ফলে দুজনের মন রসের গোপনধারা বয়ে মিলতে চলে। শিল্পী পেলে ঠিক সমঝদার, সমঝদার পেলে ঠিক শিল্পী, রসের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হল তবেই।

শিল্পায়ন। অবনীন্দ্রনাথ।

অর্ধনারীশ্বর : গুপ্ত যুগ।
মুখশ্রীর কমনীয়তা ভ্রূযুগল
ও চক্ষের অপূর্ব ভঙ্গিমায়
ভারতীয় ভাস্কর্যের ভাবধারা পরিস্ফুট।

শ্রীঅরবিন্দ : ভারতীয় ভাস্কর্যের তাৎপর্য

অনুবাদ : শিশিরকুমার ঘোষ।

অধুনা প্রতীচ্য মন প্রাচ্য চিন্তা ও শিল্পসৃষ্টির মূল্য সম্পর্কে দ্রুত সচেতন হয়ে উঠেছে যার ফলে বিদগ্ধ ইউরোপীয় সমালোচনায় প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে—ইউরোপীয় মানসের তাৎপর্যময় পরিবর্তনের অন্যতম এই লক্ষণগুলির সবে সূচনা হয়েছে মাত্র। অনুকারী বাস্তবতায় বন্দী বা ভ্রষ্ট হতে সে নারাজ, প্রকৃতির নানা বাহিরঙ্গের বন্ধন কাটিয়ে উঠে সে আনুগত্য স্বীকার করেছে সেই বিশুদ্ধ শিল্প-তত্ত্বের প্রতি যা সত্তার গভীরতম সত্য মূল্যের প্রেরণাময়ী ব্যাখ্যা—সেই প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পের নিরবধি স্বাধীনতায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে যাঁরা দেখতে পেয়েছেন ইউরোপীয় রসিক ও সৃজনী মনের মুক্তি ও পুনর্জন্মের সম্মান, সম্প্রতি এখানে-ওখানে সেই রকম সূক্ষ্ম অনুভূতিময় ও গভীর মৌলিকতাসম্পন্ন কয়েকটি মনের সাক্ষাত ঘটেছে। যদিও মূলতঃ অধিকাংশ ইউরোপীয় শিল্প পুরনো পথেই চলেছে, তবু সম্প্রতিকালের বেশ কিছু সত্যিকারের মৌলিক সৃষ্টিতে এমন কিছু সম্পদ বা অনুপ্রেরণা লক্ষ্যগোচর হচ্ছে যাতে সে ক্রমে প্রাচ্য মনোভাব ও বিচারের কাছাকাছি এসে পড়ছে। আপাততঃ এতেই তৃপ্ত হয়ে আমরা ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করতে পারি যখন, যথাকালে, এই নতুন দৃষ্টিতে নামবে আরও গভীরতা এবং তখন সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হবে ভারত-শিল্পের সত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচনা আমাদের শিল্পকে কী চোখে দেখল তাই আমাদের একমাত্র ভাবনার বিষয় নয়, বরং আমাদের এ-ও বিশেষ ক'রে জানতে হবে পূর্ববর্তী যুগের নিন্দাবাদ কী হানি ঘটিয়েছে ভারতীয় মনের, যে মন বিদেশী ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে দীর্ঘকাল পথ-ভ্রষ্ট, যার ফলে নিজের সত্য কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে কুশ্রীতা ও ভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়েছে সে, আর সে-কারণেই শিল্পরুচি ও সংস্কৃতির সুস্থ ও প্রাণবন্ত পুনরুজ্জীবন ব্যাহত এবং শিল্পসাধনার নবযুগের অভ্যুদয়ও বাধাপ্রাপ্ত। সাধারণ ইংরেজি বিচারের ধারা অনুসরণ ক'রে, অল্পকাল পূর্বেও ভারতীয় শিক্ষিত মন—'শিক্ষিত' অথচ সংস্কৃতির কণাটুকুও যার নেই—নিজেদের ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে অপরিণত ও নিকৃষ্ট শিল্প-জ্ঞানে সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করে এসেছে, অথবা তাকে মনে করেছে বিকট এবং নিষ্ফল অপসৃষ্টিই। যদিও সে অবস্থার অবসান ঘটেছে এবং বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে, তবু ধার-করা প্রতীচ্য ধারণার গুরুভার, সৌন্দর্যবিষয়ে রুচির পুরোপুরি অভাব বা আনাড়িপণা, রসগ্রহণে অক্ষমতা এখনও বহুল পরিমাণে দেখা যাবে, এখনও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বিদেশী সুরে সুর মেলানো নির্লজ্জ সমালোচনা, যা ভারতীয় রীতির সব কিছুকেই করে নিন্দা এবং প্রতীচ্য সূত্রের সঙ্গে যার মিল আছে তারই করে প্রশংসা। ইউরোপীয় সমালোচনার রীতি যে আমাদের উপর এখনও কিছু প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে তার কারণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় রসশিল্পের বা কোনো রকম সত্যিকারের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ব্যবস্থা না থাকায় আমরা হয়ে পড়েছি অজ্ঞ ও অক্ষম আধার মাত্র; ফলে ওকাকুরা বা লরেন্স বিনিয়নের মত বিচক্ষণ সমালোচকদের সুচিন্তিত অভিমত এবং আর্চারের মত রুচি ও শিক্ষাবর্জিত অনধিকারী সাংবাদিকের যথেচ্ছ অপলিখন—এই উভয়কেই সে সমান গুরুত্ব দেয়, এমন-কি শেষ জাতীয় লেখাগুলিই তার বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজেই ভ্রান্ত মূল্যে ও বিচারপদ্ধতিতে অভ্যস্ত অননুশীলিত সাধারণ মনের কাছে এখনও সত্য বিষয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে, অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ও সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন রসিক-চিত্তের কাছে তা যতই স্পষ্ট বা স্বভাবসিদ্ধ হোক না কেন। নিজেদের সত্য আত্ম-পরিচয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া—আমাদের অতীত ও বর্তমান আত্ম-সত্তায় এবং তা থেকে ভবিষ্যতে—দেশের অধিকাংশের ক্ষেত্রে সেই কাজ সবে আরম্ভ হয়েছে মাত্র।

আমাদের শিল্পের ঐতিহ্যকে তার প্রকৃত মূল্যে বুঝতে হলে বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গীর সকল রকম দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে—স্থাপত্যের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি—আমাদের ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকেও দেখতে হবে তার স্বতন্ত্র সত্তার মহিমায় ও গভীর উদ্দেশ্যের আলোকে। সেইভাবে দেখলে আমরা বুঝতে পারব প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পোৎকর্ষের শিখর-লোকের আসনের অধিকারী। আমার জানা নেই আর কোথায় পাওয়া যাবে এই শিল্পের চেয়ে গভীরতর উদ্দেশ্য, মহত্তর অন্তরাবেগ, অধিকতর সংগতিময় রূপ-দক্ষতা। হীনতর শিল্পকর্ম আছে বৈকি, যা হয়ত ব্যর্থ বা আংশিকভাবে সফল, কিন্তু সমগ্রতায় এ শিল্পকর্মকে দেখলে, এর উৎকর্ষের সুদীর্ঘ ধারা, শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শনের বহুত্বের কথা এবং একটি জাতির হৃদয়-মনকে রূপদানের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা মনে করলে আরও বাড়িয়ে বলতে প্রবুদ্ধ বোধ করি, বলতে ইচ্ছে হয় এই শিল্পেরই প্রথম বা সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের দাবী। সেই সব প্রাচীন দেশেই ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষ দেখা গিয়েছে যেখানে এক সুমহান স্থাপত্যের পটভূমিতে ও পক্ষছায়ায় একে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মিশর, গ্রীক ও ভারতবর্ষ এই জাতীয় সৃষ্টির পুরোধা। সেই উৎকর্ষ, প্রাচুর্য ও বিপুলতার তুলনায় মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইউরোপ তেমন কিছুই করতে পারেনি, যদিও চিত্রকলার ক্ষেত্রে পরবর্তী ইউরোপ দীর্ঘকালব্যাপী ও নব নব উন্মেষ-শালিনী প্রেরণায় অনেক উৎকর্ষপূর্ণ কাজ করেছে। এই দুই শিল্পে যে বিভিন্ন মনোভঙ্গীর প্রয়োজন তারাই রয়েছে এ পার্থক্যের মূলে। যে মাধ্যম বা উপকরণকে আশ্রয় করে চলে আমাদের সৃষ্টিকর্ম, তার এক নিজস্ব বিদেশী দাবী ও স্বতন্ত্র শর্তাবলী আছে শিল্পীসত্তার কাছে, যেমন অন্য প্রসঙ্গে রাস্কিন বলেছিলেন, পাথরে বা রঙ্গে কাজ করার জন্যে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন প্রাচীনদের তা ছিল, আধুনিকদের মধ্যে তার অভাব অথবা মাত্র অসামান্য কয়েকজনের মধ্যেই তা দেখা গেছে—এ এমন একটি শিল্পী মন যা নয় অতি-

মাতা ও পুত্রের সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপ : কুষাণ যুগ।

কুষাণ যুগের যুবতী যক্ষী।

মাত্রায় অস্থির, আত্মবিলাসে অসংযত, ব্যক্তিগত খেয়াল-খুসি বা ক্ষণিক উত্তেজনায় আন্দোলিত বরং সে প্রতিষ্ঠিত মনন ও দৃষ্টির উদার ভিত্তিতে, যেখানে রয়েছে মনোভঙ্গীর স্থৈর্য, দৃঢ় ও অচঞ্চল প্রত্যয়সত্যে স্থিত সেখানে কল্পনা। এই সুকঠিন উপকরণ নিয়ে তুচ্ছ ছেলে-মানুষী চলেনা, অগভীর, লঘু ও চঞ্চল রমণীয় প্রেরণা বা নিছক লালিত্য ও বাহ্য রূপমাধুরী নিয়ে দীর্ঘ লীলাবিলাস এখানে নিরাপদও নয়। রঙের লীলাধর্ম রসিক শিল্পীতে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করে বা যে স্বচ্ছন্দ বিলাসের সুযোগ তাকে দেয়, তুলির টানে, পেন্সিলে বা কলমের রেখায় গতিময় জীবন-ছন্দের যে স্বাধীন রূপায়ণ সম্ভব, ভাস্কর্যে তা নিষিদ্ধ, যদি বা কিছু পরিমাণে তা সম্ভব হয়ও, তা পারে সংযমের গণ্ডীর মধ্যেই যার বাইরে যাওয়া বিপদজনক, এমন-কি সহজে মারাত্মকও হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই শিল্পের অবলম্বন হতে পারে সুদূরস্পর্শী কোনো আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা অনন্তের কিছু আভাস এবং মহৎ বা গভীর প্রেরণা এখানে অপরিহার্য। ভাস্কর্য স্থিতিধর্মী, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, স্বভাব-দৃঢ়, মহৎ ও কঠোর এবং শিল্প-সত্তাতেও অনুরূপ গুণ-লক্ষণ দাবী করে এই শিল্প। এই ভিত্তি নির্ভর ক'রে আসতে পারে জীবনের গতি-ময়তা বা রেখার অপূর্ব নমনীয়তা কিন্তু তারা যদি এই শিল্প-মাধ্যম বা উপাদানের মৌলধর্মকে পুরোপুরি অস্বীকার করে, তাহলে বুঝতে হবে মূর্তির জায়গা জুড়েছে পুতুলের আদর্শ, তখন বুঝতে পারব ক্ষয়িষ্ণুতা আসন্ন। এই পথ বেয়ে হেলেনীয় শিল্প ফিডীয় গৌরবময়তার পর পেলব আত্ম-অনাচারের অসংযমে প্রাস্কেটিলীয় অধোগতির দিকে গিয়েছিল। এঞ্জেলো বা রদ্যাঁ বা আরও কয়েকজনের মহৎ সৃষ্টি সত্ত্বেও পরবর্তী কালের ইউরোপ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, ভাস্কর্যে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি কারণ পাথর বা ব্রঞ্জ নিয়ে বহিরঙ্গ বিলাসই হয়েছে বেশি জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই এদের ব্যবহার করা হয়েছে; তাই সে খুঁজে পায়নি গভীর কোনো অন্ত-র্দৃষ্টি বা অধ্যাত্ম প্রেরণার সুদৃঢ় ভিত্তি। অন্য দিকে মিশরে ও ভারতবর্ষে, নানা গৌরবময় অধ্যায়ে, ভাস্কর্য তার মহৎ কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। খৃষ্ট-পূর্ব পাঁচ শতকের কিছু শিল্প-নিদর্শন যা অধুনা আবিষ্কৃত

কুষাণ ভাস্কর্য। কেশবিন্যাসের ধরণ লক্ষণীয়।

হয়েছে তা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও পূর্ণ-অভিব্যক্ত শিল্প, যা থেকে তার পূর্বেকার অনবদ্য সৃষ্টির ইতিহাস সহজেই অনুমান করা চলে এবং সর্বশেষ উচ্চুদরের কিছু কাজ, আমাদের এক শক্তির পরমাশ্চর্য ক্ষণিক বিকাশ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু একবারের এই সাফল্যের পর নতুন দৃষ্টি বা সৃষ্টির অবকাশ আর কিছুই রইল না। অতি-বাস্তবতার দোহাই দিয়ে আধুনিক মন হঠাৎ বিচিত্রভাবে যে তার গতি পরিবর্তন করে অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে আজ ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে, আদতে তা বস্তুরূপেরই এক বিশেষ অভিনিবেশ যার সাহায্যে সে জড় ও প্রাণের অন্তর্নিহিত আত্ম-রহস্য উদ্ঘাটিত করতে চায়, যে-পথ ক্ল্যাসিক মনোভাব বা বিচারবুদ্ধির কাছে খোলা ছিল না। তার আপন গণ্ডীর মধ্যে গ্রীক শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, এই শিল্পের সীমিত সংকীর্ণতাকে পর্যন্ত আমরা বুঝতে অক্ষম হব—অন্ততঃ অধুনা অনেকেই যা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, সে-বিষয়ে আমাদেরও নিশ্চয়ই সচেতন হবার সময় এসেছে। গ্রীক ভাস্কর্য যা প্রকাশ করেছে তা মহৎ, রমণীয় ও ছন্দময় কিন্তু সে যা প্রকাশ করেনি এবং তার সীমিত শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যা তার পক্ষে ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না, তাও যে অসামান্য ও অসীম সম্ভাবনাময়; মানবচিত্তের উদার ও গভীর উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন সেই আধ্যাত্মিক গভীরতা ও অনুভবের ব্যাপ্তি। আর ঠিক এইখানেই ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব যে, যাকে গ্রীক রসিকচিত্ত পারেনি ভাবতে বা মূর্ত করতে তাকেই পাথরে বা ব্রঞ্জে সে প্রকাশ করেছে —এ-জাতীয় শিল্পের যথার্থ নির্দেশ গভীর শ্রদ্ধায় গ্রহণ ক'রে—তার নিজস্ব অনবদ্য মহিমায়।

উপনিষদে যা প্রেরণাময়ী ভাবরূপে অভিব্যক্ত এবং রামায়ণ ও মহাভারতে যা বাণীরূপে জীবনকে প্রভাবিত করেছে, ভারতের সুপ্রাচীন ভাস্কর্য যে তাকেই নয়ন-গ্রাহ্য রূপে মূর্ত করেছে। স্থাপত্যের মত এ-শিল্পও উৎসারিত হয়েছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গঙ্গোত্রী থেকে এবং এর শ্রেষ্ঠতম শিল্পে প্রকাশ পেয়েছে রূপের মধ্যে ভাবরূপ, দেহের মধ্যে আত্মা, দিব্য ও মানবরূপে কোনো না কোনো প্রাণবান আত্মশক্তি, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বজনীনের ব্যষ্টিরূপী ব্যঞ্জনা অথচ যা ব্যষ্টি-সর্বস্ব নয়, ব্যক্তিত্বের লীলার আধিক্যকে প্রশ্রয় দেয় না এমন একটি নৈর্ব্যক্তিকতা, অনন্তের স্থায়ী মুহূর্তগুলি, আত্মক্রিয়ায় ও সৃষ্টিতে আত্মার স্থিতি, ভাবনা, বীর্য, প্রশান্তি বা সক্রিয় আনন্দবোধ। সকল শিল্পের এই অভিপ্রায়ের কিছু অনুরণণ ও স্থির নির্দেশ দেখতে পাওয়া যাবে, এবং যেখানে ভাস্করের মন এর দ্বারা প্রভাবিত নয় সেখানেও দেখা যাবে এর ব্যঞ্জনা। কাজেই যেমন স্থাপত্যে তেমনি ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রয়োজন হবে ভিন্ন মানস, দৃষ্টি ও গ্রহণ-সামর্থ্যের; ইউরোপের বাহ্য-কল্পনাশ্রয়ী শিল্পের তুলনায় আমাদের প্রবেশ করতে হবে অন্তরলোকের আরও গভীরে যদি আমরা

প্রেমের পূর্ণ সুষমা রূপায়িত।
মিথুন যুগল : খাজুরাহো।

এ-শিল্পকে বুঝতে চাই। ফিডীয় অলিম্পিক দেবতারা মানুষেরই উন্নত ও অতিকায় সংস্করণ, অতি-সীমিত মানবিকতার হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন নৈর্ব্যক্তিকতার দিব্য শান্তি অথবা বিশ্বাত্মক দিব্য গুণ-বিশেষের সাহায্যে; অন্যান্য নিদর্শনে চোখে পড়ে বীর, ক্রীড়ক, সৌন্দর্যের প্রতীক নারী-রূপ,—ভাব, ক্রিয়া বা আবেগের শান্ত ও অন্তর্লীন মনোময় তাৎপর্যের তাঁরা প্রতীক, দেহরূপ সেখানে আত্মসত্যেরই বাহন ও আত্ম-প্রকাশের বাহ্য উপায় মাত্র; প্রতি মূর্তির সব কিছু—তার মুখ, হাত, অঙ্গভঙ্গী, দেহ-ছন্দ ও প্রকাশ, তার প্রতি সহযোগীকেই অনুপ্রাণিত ক'রে নিতে হবে অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যে, তার পূর্ণ ব্যঞ্জনার সুষমাকে অভিব্যক্ত ক'রে সাহায্য করতে হবে তার উন্মেষ—অন্য দিকে যা কিছু এই লক্ষ্যকে খর্ব করে, বিশেষ ক'রে যা শুধু মানবদেহের প্রাণিক বা শরীর, বাহ্য বা আপাতগ্রাহ্য ব্যঞ্জনার উপরেই শুধুমাত্র জোর দিয়ে থাকে, তাকে করতে হবে বর্জন। আদর্শ দৈহিক বা আবেগ-জড়িত সৌন্দর্য নয়, বরং মানবদেহ অধ্যাত্ম সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের যতখানি ধারণ করতে পারে তাকে রূপায়িত করাই এই শিল্পের লক্ষ্য। অন্তরস্থ দিব্য সত্তা এর উপজীব্য, দেহের আধারে আত্মার রূপায়ণ তাই এই শিল্পের আদর্শ ও নিহিতার্থ। শুধু মাত্র শিল্পরসিকের দৃষ্টি বা কল্পনায় এ-শিল্পকে বাইরে থেকে দেখলে বা সাড়া দিলে চলবে না, রূপ কী বহন করছে তাই আমাদের দেখতে হবে এবং তার ভিতর দিয়ে আপন অসীমতার অন্তর্নিহিত যে গভীর ব্যঞ্জনা সে ব্যক্ত করছে তার অনুধাবন করতে হবে। ভারতীয় ভাস্কর্যের ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মাচরণের সঙ্গে ভারতীয় ধ্যান ও আরাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—আত্মানুসন্ধানের এই গভীর সাধনাকে আমাদের সমালোচকপ্রবর তাঞ্জিল্যের সুরে যৌগিক বিভ্রান্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। আত্ম-উপলব্ধি এই শিল্পসৃষ্টির রীতি ও উপায় এবং একে বুঝতে হলে বা সাড়া দিতে হলে আত্ম-উপলব্ধিই হবে আমাদের সহায়। ব্যক্তিমানব বা গোষ্ঠীর রূপায়ণেও এই জাতীয় অন্তর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি ভাস্করের প্রয়াসকে চালিত করেছে। কোনো রাজা বা সাধুর মূর্তি শুধু যে সেই রাজা বা সাধুরই ধারণা দেবে তা নয়, অথবা কোনো নাটকীয় ঘটনার প্রতিফলনে বা পাথরে বাস্তবানুগ কোনো চরিত্রচিত্রণেই ভাস্করের কাজ শেষ হলনা বরং আত্মার কোনো অবস্থা, অভিজ্ঞতা বা গভীর কোনো আত্মবৈভবকে মূর্ত করাই তাঁর লক্ষ্য।

দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনরতা নারী।
বাহ্য বা আপাতগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা নয়,
মানুষী দেহের অধ্যাত্ম সৌন্দর্য
ও তাৎপর্যের প্রকাশ যা
ভারতীয় ভাস্কর্যের মূল কথা।

অ্যাপোলো মূর্তির গান্ধার রূপায়ণ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বাইরের অনুভবকে নয় বরং ইষ্ট-বিগ্রহের সামনে সাধু বা পূজারত ভক্তের দিব্য দৃষ্টি বা ভাবাবেশের অন্তরঙ্গ আত্ম-সত্যকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর আসল কাজ। ভারতীয় ভাস্কর এই জাতীয় প্রয়াসেই ব্রতী হয়েছিলেন এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধিই তাঁর সাফল্য বিচারের মাপকাঠি হবে। যে লক্ষ্য বা গুণে তাঁর মনোধর্মে বিজাতীয়, যে কারুকৌশল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত তেমন কোনো ত্রুটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা এক্ষেত্রে নিরর্থক।

একবার যদি স্বীকার করে নিই এই আদর্শকে, তা হলে যে দক্ষতায় এই কার্য সম্পাদিত হয়েছিল, এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিতে যে অবিসংবাদিত মহিমা ও সৌন্দর্য মূর্ত হয়েছিল, যে গভীর প্রজ্ঞা-সম্মত নীতি নির্দেশে ভারতীয় ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটেছিল, তার সম্পর্কে অতিশয়োক্তি না করাই কঠিন হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গুহামন্দিরের বা চৈত্যের একক বা দলবদ্ধ শ্রেষ্ঠ ও দিব্য বুদ্ধমূর্তিগুলিকে,—গান্ধার মূর্তিগুলি নয়—শেষ যুগের দক্ষিণের শ্রেষ্ঠ ব্রঞ্জগুলিকে—গাঙ্গুলি মশায়ের বইটিতে যার কয়েকটি অপূর্ব সংগ্রহ রয়েছে—কালসংহার নটরাজ মূর্তিগুলিকে নেওয়া যেতে পারে। কল্পনা ও কৃতির দিক দিয়ে এর চেয়ে সূক্ষ্ম ও মহত্তর শিল্প মানুষ আজ পর্যন্ত কোথাও করতে সক্ষম হয়নি এবং অধ্যাত্ম শিল্পদৃষ্টির প্রেরণাকে গ্রহণ করার ফলেই সেই শ্রেষ্ঠত্বের আরোও উৎকর্ষ ঘটেছে। একটি সীমিত বুদ্ধমূর্তিতে অসীমের প্রকাশ, মানুষী তনু ও মুখশ্রীর ভিতরে নির্বাণের অপার প্রশান্তিকে মূর্ত করে তোলা, একে নিশ্চয় অকিঞ্চিৎকর বা বর্বর কীর্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কালসংহার শিবমূর্তিতে যে মহিমা, শক্তি, প্রশান্ত বীর্যবান সংযম, মর্যাদা ও অস্তিত্বের রাজকীয়তা ভাবে-ভঙ্গীতে ওতঃপ্রোত, তা তার মহত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় নয়—এ তো তার সম্পূর্ণ কীর্তির অর্ধাংশ বা তা-ও নয়—বরং কাল ও অস্তিত্ব-জয়ী অধ্যাত্মের সংহত দিব্য বিভা যা শিল্পী এই শিবদেহের চোখে, মুখে, ভ্রূযুগলে ও প্রতি ভঙ্গীতে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন, সেই নিহিত ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম অভিব্যক্তি দেবদেহের প্রতি অঙ্গে—যা আবেগ আশ্রয়ী নয় কখনো—সৃষ্টির এই পূর্ণ ঐক্যের ভিতর দিয়ে পরম তাৎপর্যের ছন্দ শিল্পী প্রবাহিত করে দিয়েছেন। এই ভাস্করশ্রেষ্ঠদের আশ্চর্য প্রতিভা ও শিবের বিশ্বছন্দ ও নৃত্যোল্লাস রূপায়ণের দক্ষতা বিষয়ে কী বলব যেখানে প্রতি দেহভঙ্গীতেই তাৎপর্যের সকল ছন্দ রূপায়িত হয়েছে, যেখানে মহোল্লাস দুর্বার চক্র-নৃত্যে গতির তীব্রতা সত্ত্বেও যথোচিত সংযম বজায় থেকেছে, যেখানে শিল্পীর রসগ্রাহী ভাবনায় এক-ই বিষয়বস্তুতে প্রতি ভাবই বৈচিত্র্যের সূক্ষ্ম স্পর্শে ধন্য হয়েছে? কালের ধ্বংসের হাত এড়িয়ে অথবা বিরাট মন্দিরগুলিতে যে-সব মূর্তি আজো রয়ে গেছে, তাতে সনাতন শিল্পের একই মহৎ ঐতিহ্য দেখতে পাওয়া যাবে। যে সব প্রতিভাবান শিল্পীরা বহুতর রীতিতে সেই ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই কাজ করেছেন তাঁরা প্রত্যয়ে অবিচল ও গভীর অধ্যাত্ম ভাবনায় আস্থাবান ছিলেন; তাই প্রতি ভঙ্গীতে, রেখায় ও ঘনতায়, হাত ও অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, ব্যঞ্জনাত্মক মুদ্রায় ও প্রকাশময় ছন্দে শিল্পকর্মের সুসংগত প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তার স্বীয় মহিমার আলোয় এই শিল্পকে দেখলে প্রাচীন বা আধুনিক, গ্রীক বা মিশরীয়, প্রাচ্য বা প্রতীচ্য, নিকট বা সুদূর পূর্বাঞ্চলীয় যে-কোনো সৃজনশীল যুগের যে কোনো শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনায় এই

শিল্পের শঙ্কিত হবার কিছু নেই। অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে এই ভাস্কর্য, বৈদিক ও বৈদান্তিক স্রষ্টা ও মহাকবিতে যে প্রেরণা বিরাজমান ছিল, এই আশ্চর্য মহিমান্বিত সুপ্রাচীন মহাকাব্য-সদৃশ শিল্পকেও অনুরূপ প্রেরণাই উন্নীত করেছিল; পরবর্তী পৌরাণিক যুগে এ শিল্প ফিরেছে ছন্দ, সৌন্দর্য ও উল্লাসের দিকে, তাতে ছিল খণ্ডকাব্যের গতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাস, সব শেষে তাতে দেখা দিল দ্রুত ও সার্থকতাহীন অবক্ষয় কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কালেও প্রেরণার গভীরতা ও মহত্ত্ব এই ভাস্কর্যের সহায় হয়েছে, তাকে করেছে প্রাণবন্ত এবং ক্ষয়-প্রবণতার মুখেও সেই সত্যের কিছু অবশেষ থেকে গেছে, যা এই শিল্পকে সম্পূর্ণ অধঃপাত, রিক্ততা ও নিরর্থকতার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

এবারে তা' হলে ভারতীয় ভাস্কর্যের রীতি ও আদর্শ সম্পর্কিত আপত্তির মূল্য নিরূপণ করা যেতে পারে। শয়তানের সমর্থকের অপভাষণের মূল কথা হল এই যে, আপন সীমায় আবদ্ধ ইউরোপীয় মনের কাছে এই ভাস্কর্য বর্বর, অর্থহীন, শ্রী-শূন্য, আশ্চর্য ও অদ্ভুত রূপে প্রতিভাত হয়—অসুন্দর অবাস্তবের দুঃস্বপ্নলোকে এ যেন বিকৃত কল্পনার ব্যর্থ প্রয়াস। অধুনালভ্য সমগ্র শিল্পনিদর্শনগুলির মধ্যে এমন অনেক শিল্পকর্ম আছে যা যথেষ্ট প্রেরণা-সম্পন্ন নয়, এমন কাজও আছে যা অপকৃষ্ট, বাহুল্যদুষ্ট, উদ্ধত বা কদর্য, কোথাও পরিচয়হীন মহৎ শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে মিশেছে কারিগরের যান্ত্রিক কারুকর্ম। কাজেই যে দৃষ্টিতে এই শিল্পের তাৎপর্য ও মূল শর্ত, এই জাতি-মানস ও তার বিশিষ্ট শিল্পরীতি ধরা পড়েনি সে যে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট শিল্পকর্ম, অবক্ষয়ের শিল্প এবং শ্রেষ্ঠ যুগ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের পার্থক্য বিচারে অক্ষম হবে, তাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু সমগ্র শিল্প-বিচারে এই ধারণা প্রয়োগ করলে সমালোচনাই হয়ে দাঁড়াবে বিকৃত ও বীভৎস; আর তা হলে এই অনুমানই করতে হবে যে এখানে রয়েছে এমন বিচিত্র ভাবনা ও মূর্তিমতী কল্পনা যা প্রতীচ্য বুদ্ধির অগোচর। রেখা, রীতি ও গতির ধর্মের দিক থেকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় রসবোধে পার্থক্য আছে। কেবল ভাস্কর্যে নয়, অন্যান্য শিল্পে, সঙ্গীতে, এমন-কি সাহিত্যের

বোধিসত্ত্ব : গান্ধার ভাস্কর্য।

ক্ষেত্রে যে পার্থক্য আমরা দেখতে পাই তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সময়সাপেক্ষ; মোটামুটি ভাবে আমরা বলতে পারি যে যেখানে ভারতীয় মন আত্মজিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্ম-সংবেদনশীলতায় অনুপ্রাণিত, সেখানে রসসন্ধানী ইউরোপীয় মনোভঙ্গী বুদ্ধি-নির্ভর, প্রাণিক, আবেগ-আশ্রয়ী ও কল্পনাপ্রবণ। রেখা, বস্তু-সংস্থান অলংকরণ, সঙ্গতি ও ছন্দ সম্পর্কিত যে ভারতীয় পদ্ধতি তাকে বুঝে উঠতে না পারার অনেকখানির মূলে রয়েছে এই পার্থক্য। প্রায় ভিন্ন জগতের অধিবাসী এই দুটি মন, তাদের দৃষ্টি যেন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে নিবদ্ধ অথবা যেখানে বস্তু অভিন্ন সেখানেও দেখার কাজ চলছে ভিন্ন স্তর বা ভিন্নতর পরিমণ্ডল থেকে। আর দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টির তারতম্যের গুণে বিষয়ের যে কী আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে তা-ত আমাদের অবিদিত নেই। অধিকাংশ

ভারতীয় ভাস্কর্যে বাস্তবতার অভাব সম্বন্ধে আর্চারের অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আছে। এর প্রেরণা ও দৃষ্টি-কোণ সত্যিই বস্তুতান্ত্রিক নয় অর্থাৎ বাহ্য বা পার্থিব প্রকৃতির প্রাণবান, নির্ভরযোগ্য, যথাযথ, ছন্দোময়, সুন্দর ও বলিষ্ঠ, এমনকি আদর্শনিষ্ঠ বা কল্পনাপ্রবণ অনুকৃতি এর লক্ষ্য নয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের রূপায়ণ বা তার গৌরববর্ধন ভারতীয় ভাস্করের লক্ষ্য নয়, অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা ও অনুভবের রূপায়ণেই তিনি ব্রতী। দৈহিক ও পার্থিব বিষয়ের বাঞ্ছনা থেকে তাঁর কাজের সূত্রপাত হতে পারে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তখনই সার্থক, যখন বাহ্যবিষয়ের নিরতিশয় প্রভাব থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি তাদের দেখেন মগ্নচিত্তের স্মৃতিলোকে, নিজের মধ্যে তাদের এমন রূপান্তর ঘটান যার ফলে ব্যক্ত হয় ইন্দ্রিয়জ সত্য অথবা প্রাণিক ও বুদ্ধিগত তাৎপর্যের অতিরিক্ত অন্য কিছু। তাঁর চোখে ধরা পড়ে বস্তুর অন্তর্লীন রেখা ও ছন্দ এবং তার স্পর্শেই বস্তুর রূপরেখায় রূপান্তর ঘটে। এই বিশিষ্ট রীতির শিল্প-সৃষ্টি যে সাধারণ প্রতীচ্য মন ও দৃষ্টির কাছে অদ্ভুত ঠেকবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, বিশেষ ক'রে যখন উদার ও সহৃদয় সাংস্কৃতিক বোধের স্পর্শে সে মন ও দৃষ্টির মুক্তি ঘটেনি। আমাদের কাছে যা অপরিচিত, আমাদের অভ্যস্ত মন স্বভাবতঃই তার প্রতি বিরূপ বোধ করে, আমাদের অভ্যস্ত বুদ্ধিতে তাকে অসুন্দর মনে হয় এবং যে রসবোধের অনুশীলনে ও কল্পনা-প্রবণ ঐতিহ্যে আমরা অভ্যস্ত তার সঙ্গে তাকে একেবারে সামঞ্জস্যহীন মনে হয়। দৃষ্টির কাছে যা পরিচিত বা কল্পনায় যা সহজ-আয়ত্ত সে-জগতকেই আমরা পেতে চাই; আমাদের স্থিতি ও আনন্দের এই অভ্যস্ত বৃত্তের বাইরে যে অন্য কোনো বা মহত্তর সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সম্ভব সে-কথা আমরা সহজে স্বীকার করতে চাই না।

বিশেষ ক'রে মানবদেহে মানসী দৃষ্টি প্রয়োগের ফলে ভারতীয় ভাস্কর্যের তথাকথিত সমালোচকেরা পীড়িত বোধ করেন। বহু হস্ত সমন্বিত দেব দেবীদের সম্পর্কে পরিচিত আপত্তি তো রয়েছেই, শিবের চার, ছয়, আট বা দশটি হাত, অষ্টাদশভুজা দুর্গা, এসবই দানবীয়, প্রকৃতিবহির্গত, তাই আপত্তি। সাধারণ নরনারীর রূপায়ণে এ-জাতীয় কল্পনাবিলাস নিঃসন্দেহে অপ্রাসঙ্গিক কেননা তাতে শিল্পগত বা অন্য কোন তাৎপর্য নেই কিন্তু ভারতীয় দেবদেবীর বিশ্বরূপ প্রকাশে এ-স্বাধীনতা কেন অস্বীকৃত হবে তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। সমগ্র সমস্যাটি মূলতঃ এই—প্রথমতঃ একটি বিশেষ তাৎপর্য প্রকাশের পক্ষে এই রীতি যথোচিত কিনা, যা ভিন্নতর কোন রীতিতে সমান শক্তি ও বীর্যে প্রকাশ করা সম্ভব হতনা। দ্বিতীয়তঃ শিল্প সত্য ও ঐক্যের এক ছন্দোময় প্রকাশ হিসেবে এর শিল্পসম্মত রূপায়ণ সম্ভব কিনা, না-ই বা হল তা জড়-প্রকৃতির রূপায়ণ। তা যদি না হয়, তা হলে এ শিল্প কদর্য ও পীড়াদায়ক; কিন্তু এই সমস্ত শর্ত যেখানে মেনে নেওয়া হয়েছে সেখানে এই রীতির সার্থকতা আছে বৈ কি এবং এই জাতীয় কোন অনবদ্য সৃষ্টি-কর্মের সামনে দাঁড়িয়ে বিরুদ্ধ কণ্ঠ উত্থাপনের কোনো অধিকার আমাদের আছে বলে স্বীকার করে নিতে পারিনা। আর্চারের চোখে বিসঙ্গত এই সব অনাবশ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ও নৃত্যরত শিবদেহে এমন সুষমায় সুবিন্যস্ত যে ব্যক্তিগতভাবে আর্চার সাহেব পর্যন্ত তার নৈপুণ্যে ও শ্রেষ্ঠত্বে বিস্মিত বোধ করেছেন। অবশ্য এ-টুকুও যে-দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না সে-ত অবিশ্বাস্য-রূপে অন্ধ—কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হল, যে-নৈপুণ্য এই শিল্প-তাৎপর্যকে প্রকাশ করার কাজে প্রযুক্ত হয়েছে তাকে বুঝতে পারা, এবং তা হলেই আমরা বুঝতে পারব যে বিশ্বনৃত্যের অধ্যাত্মভাব ও ব্যঞ্জনাকে এখানে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে অন্য কোন দ্বিভুজ মূর্তিতে তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। অসুরদলনী অষ্টাদশ-ভুজা দুর্গার সম্পর্কেও ঐ একই সত্য প্রযোজ্য অথবা বিখ্যাত পল্লব শিবমূর্তিগুলির ক্ষেত্রেও, সেখানে নট-রাজের লিরিক সৌন্দর্য নেই বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে রয়েছে মহাকাব্যের ছন্দ ও মহৈশ্বর্য। প্রতি শিল্পই তার নিজস্ব রীতির সার্থকতা প্রমাণ করে এবং এখানে তা সম্পন্ন হয়েছে অনবদ্য মহিমায়। কয়েকটি মূর্তির বঙ্কিম ভঙ্গীর ক্ষেত্রেও ঐ এক-ই নিয়ম সত্য। এতে শারীরস্থান-সম্মত মানবদেহের আদর্শের অনেক সময় ব্যত্যয় ঘটে সত্য, অথবা—বিষয়টি ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়—দেহের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন অসাধারণ ভঙ্গিমার উপর কম-বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। তখন প্রশ্ন ওঠে, এ সৃষ্টি কি অর্থ বা লক্ষ্য বর্জিত, এ কি শুধু

ভারহুত যক্ষী। বিলিফ
কার্ভিং-এ নারীমূর্তির
অপূর্ব ছন্দময় রূপরেখা
বিধৃত এই প্রাচ্যের ভাস্কর্যটিতে।

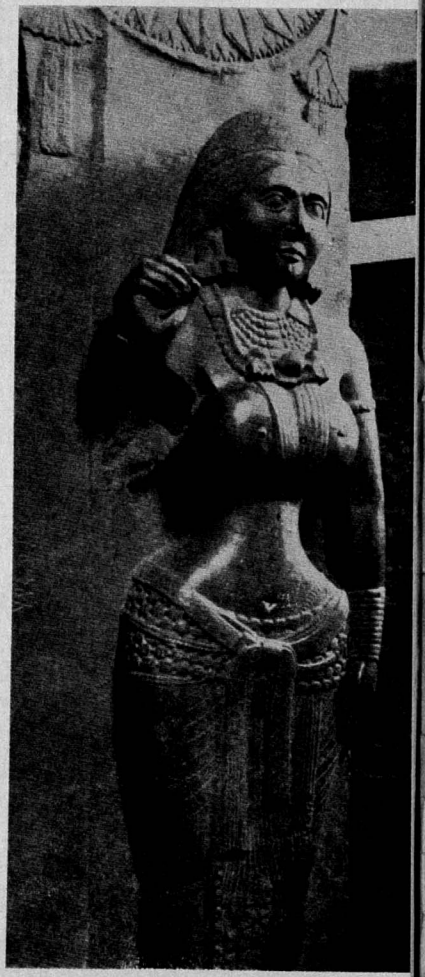

সোচ্চার কুশ্রীতা বা কদর্যতা, না এ রীতি বিশেষ কোন তাৎপর্যের দ্যোতক যা প্রকৃতির স্বাভাবিক জড় নিয়মের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করেছে সার্থকতর এক শিল্পছন্দ ও অভিপ্রায়। অসামান্য বিষয়ের অবতারণা করা, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো বা তাকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া এসব শিল্পের দিক থেকে কোন দিনই নিষিদ্ধ ছিল না; এমন কথাও বলা চলে যে, যেদিন থেকে শিল্প মানুষের কল্পনার সহায় হয়েছে, মহাকাব্যের বিরাট অতিরঞ্জনের সে-ই আদিপর্ব থেকে আধুনিক রোম্যান্টিক ও বস্তুতান্ত্রিক উচ্ছ্বাসের কাল পর্যন্ত, বাল্মিকী ও হোমারের গৌরবময় যুগ থেকে হুগো ও ইবসেনের কাল অবধি শিল্পের অন্য করণীয় তেমন কিছু ছিল না। রীতি ও উপায়ের মূল্য আছে বইকি, কিন্তু শিল্পী যা রচনা করলেন এবং তাঁর সৃষ্টিতে মানবাত্মার স্বপ্ন ও সত্য যে শক্তি ও সৌন্দর্যে প্রকাশিত হল তার তাৎপর্য অধিক মূল্যবান।

তার নিজস্ব শিল্পগত লক্ষ্যের দিক থেকেই মানব-দেহের শিল্পসম্মত প্রয়োগের ভারতীয় রীতিকে বিচার করতে হবে। এক বিশেষ অভিপ্রায় ও আদর্শ তার অবলম্বন, সে আদর্শ বা নির্দেশ এত ব্যাপক যে তার মধ্যে একদিকে যেমন বহুধা বৈচিত্র্যের অবকাশ আছে, অন্যদিকে তেমন সঙ্গত ব্যতিক্রমও অসম্ভব নয়। এর গুণলক্ষণগুলিকে তাচ্ছিল্য করার চেষ্টায় আর্চার সাহেব যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ করেছেন তা নিতান্তই অলীক, ছিদ্রদর্শী, অতিরঞ্জিত ও সাংবাদিকের কষ্টকল্পিত রচনা। একটি সুন্দর, সুসঙ্গত শিল্পাদর্শ যার প্রতি তিনি সহানুভূতি-সম্পন্ন নন তাকে হেয় করবার উদ্দেশ্যেই যেন তিনি এই ভূমিকা নিয়েছেন। বীতশ্রদ্ধ মন সেখানে শুধু শোন মুখ, ক্ষীণ কটি, শীর্ণ চরণ ও এবংবিধ নানা বিকৃতির পুনরাবৃত্তিই দেখেছে, সেখানে যে আরও বড় অনেক কিছু আছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের শারীরস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল, হ্যাভেলের এই অনুমানেও তিনি সন্দেহ

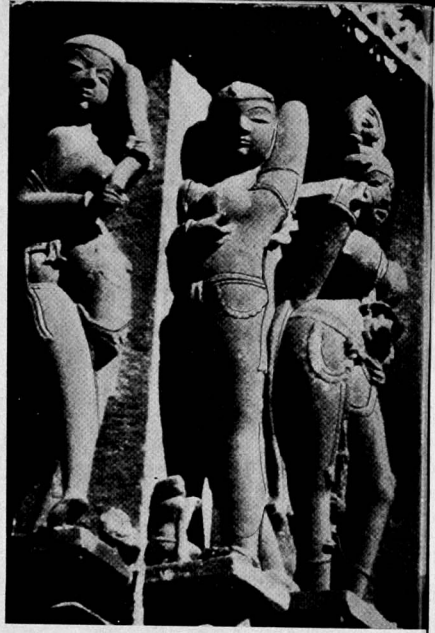

সুরসুন্দরী : খাজুরাহো।
রেখার বিশুদ্ধতা ও রূপের
সূক্ষ্ম রমণীয়তায় মূর্তিগুলি অনবদ্য।

প্রকাশ করেছেন। সে-কথা জানা ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানেও কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্যের প্রয়োজনেই শিল্পীরা ব্যতিক্রমের পথও বেছে নিয়েছেন। এতে আমি-ত আপত্তির তেমন কিছু দেখিনা, কেননা শিল্প-ত শারীরস্থান-চর্চা নয়, এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শনকে যে বাস্তব ঘটনার হুবহু প্রতিরূপ বা পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। পেশিসংস্থান, স্কন্ধ ও বক্ষাবয়ব ইত্যাদির সোচ্চার অনুশীলনের অভাবে আমি দুঃখ বোধ করার হেতু দেখিনা কারণ তাদের নিজস্ব কোন শিল্পগত মূল্য আছে বলে আমি মনে করিনা। আদত কথা হল, ছন্দ ও সংগতি সম্পর্কে ভারতীয় শিল্পীদের অভ্রান্ত ধারণা ছিল এবং কয়েকটি রীতিতে বিশেষ শক্তি ও মহত্ত্বের সংগে তাকে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন, অন্যত্র, যেমন জাভায়, গৌড়ীয় রীতিতে বা দক্ষিণী ব্রঞ্জে তারই সংগে আরও যুক্ত হয়েছে অনবদ্য রমণীয়তা এবং কখনো বা তীব্র নিবিড় মাধুর্য। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মূর্তিগুলিতে মানবদেহ এমন সৌন্দর্য ও মহিমায় রূপায়িত হয়েছে যা তুলনা-রহিত, কিন্তু এ শিল্পের লক্ষ্য ও চরিতার্থতা বহিরংগ বাস্তবতার নয় বরং আত্মিক ও চৈত্ত্য-সৌন্দর্যে এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যেই ভাস্কর সংগত কারণেই নিবৃত্ত হয়েছেন স্থূল বহিরংগ বাহুল্যের পথ না গ্রহণ করতে, পরিবর্তে রেখার বিশুদ্ধতা ও রূপের সূক্ষ্মতা বিধানই তিনি লক্ষ্যরূপে নিয়েছেন। সেই পরিমণ্ডলে, সেই

খাজুরাহো-র আর একটি
আত্মমগ্ন কালজয়ী সৌন্দর্য।

বিশুদ্ধতা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের জগতে তাঁর সকল অভিপ্রায়েরই চরিতার্থতা সম্ভব হয়েছে, বীর্য-ঘন রূপ, সূক্ষ্ম রমণীয়তা, অবিচল মাহাত্ম্য বা প্রবল পরাক্রম অথবা গতির সংযত তীব্রতা, অথবা সব কিছুই যা তাঁর অভিপ্রায়ের সাধক ও সহায়ক। দিব্য ও সূক্ষ্ম তনু যেখানে আদর্শ সেখানে অমার্জিত ও বস্তু-সর্বস্ব রুচি বা কল্পনা নিয়ে সেই আদর্শের সত্য ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; তাইত সে মনের কাছে এই আদর্শই হয়ে দাঁড়ায় অন্তরায়স্বরূপ এবং বর্জনীয়। কিন্তু শিল্পের জয়যাত্রা জড় ও বস্তুবাদী মানুষের কুসংস্কারে ব্যাহত হতে পারে না; যা সাধুসম্মত, শ্রেয়র কাছে যার আবেদন তাই কালজয়ী ও বিজয়ী হবে, সূক্ষ্মতম চৈত্ত্য-কল্পনা ও অন্তরতম আত্মাকে যা তৃপ্তি দিতে পারে তাইত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ শিল্প।

শিল্পের প্রতিটি রীতির আছে নিজস্ব আদর্শ, ঐতিহ্য ও সর্বসম্মত বিধি; কেননা শিল্পীসত্তার রূপ ও ভাবচিন্তা বহুধাব্যাপ্ত, যদিও তাদের মূলগত ভিত্তি একই। চৈনিক ও জাপানী শিল্পীর পরিপ্রেক্ষিত ও চিত্তদৃষ্টির ধারা ইউরোপীয় শিল্পীদের থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু সেই শিল্পের পরম বিস্ময় ও রমণীয়তা কে অস্বীকার করবে? আমার স্থির বিশ্বাস যে আর্চার সাহেব কনস্টেবল বা টার্নারের ছবিকে সমগ্র প্রাচ্যদেশীয় শিল্পের ঊর্ধ্বে স্থান দেবেন, মনোনয়নের স্বাধীনতা থাকলে আমিও যেমন বেছে নিতাম কোন চীনা বা

একটি সীমিত বুদ্ধমূর্তিতে
অসীমের প্রকাশ, মানুষী তনু ও
মুখশ্রীর ভিতরে নির্বাণের
অপার প্রশান্তি।
মহাজাতির অন্তরাত্মার
মহাভাষ্য এই ভাস্কর্য।

জাপানী ল্যান্স্কেপ বা প্রকৃতির ঐন্দ্রজালিক রূপান্তরের অন্য কোন নিদর্শন; কিন্তু এ-সবই হল ব্যক্তিগত, জাতিগত, বা পরিমণ্ডলজাত মেজাজ বা পক্ষপাতের কথা। আত্মায় বিধৃত সত্য ও সৌন্দর্যের সার্থক রূপায়ণই হল সমস্যার সার কথা। ভারতীয় ভাস্কর্য বা সমগ্রভাবে ভারতশিল্প স্বীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য আশ্রয় ক'রেই চলতে চায়, অনন্য এদের গুণ ও চরিত্র-লক্ষণ। সব মিলিয়ে বিচার করলে বহু যুগ ও শতাব্দীর সৃষ্টি-সম্পদ এই শিল্পধারা নিঃসন্দেহে মহৎ। সুপ্রাচীন ও দুর্লভ প্রাক-অশোকীয়, অশোকীয় অথবা পরবর্তী ও প্রথম মহাকাব্যের যুগের ভাস্কর্যে বা গুহামন্দিরের ঐশ্বর্যদীপ মূর্তিসমূহে, পল্লব রাজকুলের এবং অন্যান্য দক্ষিণী মন্দিরের এবং এর পরের কয়েক শতাব্দীর বাংলা, জাভা, নেপালের মহান, বৈভবমণ্ডিত ও সুচারু কল্পনা-দীপ্ত কাজে, অথবা দক্ষিণের ধর্ম-ভিত্তিক ব্রঞ্জের কাজের অনন্য দক্ষতা ও সূক্ষ্মতায়—সর্বত্রই অনবদ্য ও অনুপম এর শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলি। মানসগঠন ও গুণলক্ষণে পৃথিবীর অপরাপর জাতি থেকে স্বতন্ত্র, অধ্যাত্ম সাধনায়, সুগভীর দর্শনতত্ত্বে, ধর্মপ্রাণতায়, শিল্পরুচি ও সমৃদ্ধ কবি-কল্পনায় খ্যাতকীর্তি এক মহাজাতি ও সুমহান সংস্কৃতির চিত্তাদর্শ ও মর্মবাণীর অভিব্যক্তি ঘটেছে এই শিল্পে। জীবনবোধে, রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনে ও সামাজিক উদ্যমের ক্ষেত্রে এ জাতি একদিন কিছু ন্যূন ছিল না। ব্রঞ্জে ও পাথরে উৎকীর্ণ, ঐশ্বর্যে ও আকর্ষণে অনন্য, সেই মহাজাতির অন্তরাত্মার মহাভাষ্য এই ভাস্কর্য। বহুযুগব্যাপী শ্রেষ্ঠত্বের শেষে এই জাতি ও তার সংস্কৃতিতে সাময়িক ব্যর্থতার ছায়া নেমেছে দেখতে পাই, এ-জাতীয় ব্যর্থতা ইতিপূর্বে অন্য জাতির ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে, আজ যাদের গৌরবদীপ্তি, ভবিষ্যতে তারাও একদিন ম্লান হবেন; আজ সে মনের সৃষ্টি-নির্ঝর ব্যাহত, অপরাপর শিল্পের মত এ শিল্পেও এসেছে ছেদ

মথুরার ভাস্কর্যের তাৎপর্যপূর্ণ নারীমূর্তি।

ও অবক্ষয়—কিন্তু যেখানে এর অনাদি উৎস, সে অন্তরবহ্নি আজও অনির্বাণ এবং নবজন্মের যে সূচনা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই শিল্পেরও পুনরুজ্জীবন আসন্ন, আধুনিক প্রতীচ্য শিল্পকর্মের সংকীর্ণ গতিতে বাধা পড়বে না সে, বরং সতেজ হয়ে উঠবে সেই সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক প্রেরণার নবীন আবেগ ও মহাবীর্যে। আবার ফিরে আসুক অতীত কীর্তির সেই মহৈশ্বর্য, সৌন্দর্য ও অন্তরতম তাৎপর্য, যা কেবল অতীত রূপৈশ্বর্যের পুনরাবৃত্তিই হবে না এবং বিজাতীয় মনের নিন্দাভাষণেও রইবে অবিচল; কেননা আধ্যাত্মিক প্রয়াসের এই পারম্পর্যের উপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যতের মহত্তম সম্ভাবনা।

শুকনো কাঠ কুঁদে কুঁদে তোমার জটিল অবয়ব
গড়া হয়। করতলে কটি-সীমা নগ্ন নাভিমূলে।
জঙ্ঘায় দেহের ভার ন্যুব্জ তনু; স্থির উরু তুলে'
ঈষৎ কটাক্ষে যেন দেখ তুমি নিজের বৈভব।
ততোই আমি কি দেখি তোমাকে, একান্ত অনুভব
করি আমি নিজেকেই তোমার ভেতরে। এ-আঙুলে
দেখি কোনো চিহ্ন আছে কি-না, গভীরতা পাকা চুলে।
আমি দেখি শুকনো কাঠে অভিনব জীবন-গৌরব।

পউষের শুকনো কাঠ মৃত্যু-শেষে একা চৈত্র-ঝড়ে
প'ড়ে ছিল। নিজেরি চিতায় হোত আগুনে বিলীন
ধীরে ধীরে। হঠাৎ তাকেই তুলে এনে এই ঘরে
বাটালি ও ছেনি দিয়ে কী আশ্চর্য প্রেমে একদিন
হঠাৎ করেছি তিলে তিলে তার প্রতি অঙ্গ জয়।
যতো তাকে দেখি, ভাবি—মৃত্যুতেই শেষ মৃত্যু নয়।

দুর্গাদাস সরকার

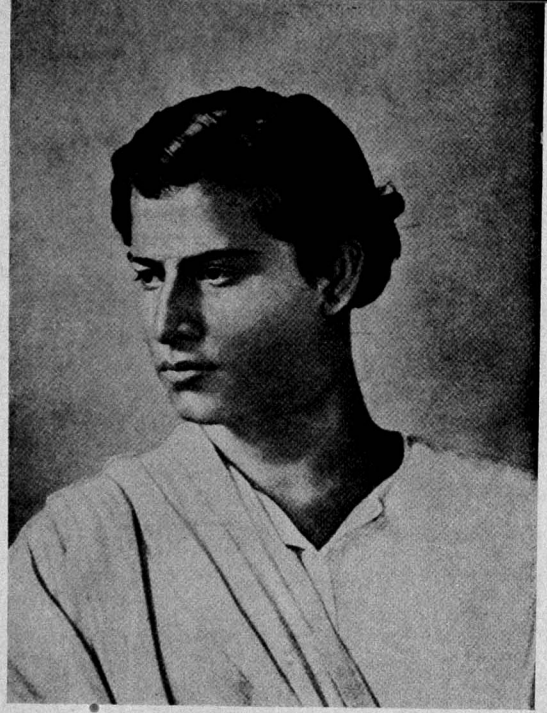

দিবাকান্তি তরুণ দেবীপ্রসাদ।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সোনার ঝিনুকবাটির সৌভাগ্য নিয়ে মুড়াগাছার (ডায়মণ্ডহারবার) জমিদার স্বর্গীয় উমাপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর শিশু-সন্তান দেবীপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হোয়েছিলেন এক স্মরণীয় ক্ষণে মামার বাড়ী তাজহাটের (রংপুর) রাজবাড়ীতে।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মাটি, রঙ, তুলির প্রতি সুগভীর টান। কোলকাতার ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন ইস্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন বটে, কিন্তু ইস্কুলের শিক্ষা তাঁর কাছে আকর্ষণীয় না হওয়ায় তিনি ইস্কুল ছেড়ে শিল্প সাধনায় মনোনিবেশ করেন। দেবীপ্রসাদ কোনো চিত্র বা ভাস্কর্য-শিল্প শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করেন নি। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কাছে আধুনিক বাঙলার চিত্রাঙ্কন ধারা, অধ্যাপক ই, বাইসের কাছে পাশ্চাত্যধারায় তেল ও মডলিং এবং শ্রীহিরণ্ময় রায়-চৌধুরীর কাছে তিনি মডলিং শিক্ষা করেন।

দেবীপ্রসাদ জমিদারীর কাজ দেখাশুনো করেন—এই ছিল তাঁর বাবার ইচ্ছে। কিন্তু দেবীপ্রসাদ জমিদারী ও প্রজাশাসনের মোহ ত্যাগ কোরে সত্য-শিব-সুন্দরকে জীবনের সব কিছু বোলে স্বেচ্ছায় গ্রহণ কোরে নেন। এ-জন্য তাঁকে কম দুঃখ সহ্য কোরতে হয়নি। জমিদার-বংশের সন্তান দেবীপ্রসাদ রাস্তায় রাস্তায় ছবি ফেরি কোরেছেন, চল্লিশ টাকা মাইনেতে ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিট্যুশনে শিল্প-শিক্ষকের চাকুরী কোরেছেন। পরবর্তীকালে যদিও তিনি মাদ্রাজ সরকারী ও কারু-কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও নিখিল ভারত ললিত-কলা আকাদমির সভাপতি হোয়েছেন, তবুও শিল্পীকে সকল বিরোধিতা ও বিরূপতার বিরুদ্ধে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সংগ্রাম একদিন সুরু কোরে-ছিলেন আজও অবিচ্ছিন্নভাবে সে সংগ্রাম তিনি চালিয়ে চলেছেন।

উনিশশো আটাশ সাল থেকে দেবীপ্রসাদ মাদ্রাজবাসী। ইউনেস্কোর সভাপতি এবং আর্ট ও কালচারের ডিরেক্টর হিসেবে একমাত্র জাপান ছাড়া দেবীপ্রসাদ তাঁর সাধন-ক্ষেত্র মাদ্রাজ ছেড়ে আর কোথাও কখনো নড়েন নি। লণ্ডন, প্যারিস, সোভিয়েত, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শিত হোয়েছে।

যদিও ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন তাঁর ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম, তথাপি কথা-সাহিত্য তাঁর হাতে অভিনব রূপে রূপায়িত হোয়েছে। তাঁর প্রথম বই : বল্লভপুরের মাঠ (গল্প সঙ্কলন)। অন্যান্য বই : পিশাচ (উপন্যাস), বুভুক্ষু মানব (গল্প সঙ্কলন), নতুন হাওয়া (শ্লেষাত্মক নাটিকা), জঙ্গল (শিকার কাহিনী) ইত্যাদি। ইংরাজীতে

ভাস্কর্য

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

লেখা তাঁর দুখানি বই আছে।

দেবীপ্রসাদ একজন নির্ভীক শিকারী। যৌবন থেকেই তাঁর শিকারের শখ বা নেশা। এ-ছাড়া সুগায়ক ও সংগীতশাস্ত্রে পণ্ডিত বোলে তাঁর খ্যাতিও কম নয়। মুড যখন আসে তখন সাহিত্য রচনা করেন, মূর্তি গড়েন, ছবি আঁকেন, কিন্তু গান-বাজনাই হোল তাঁর সব থেকে প্রিয় জিনিস। তিনি একজন ভালো বাঁশি-বাজিয়েও।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের একত্রিংশত্তিতম অধিবেশনে (মাদ্রাজ শহরে অনুষ্ঠিত) ছাপ্পান্ন বয়স্ক ভাস্কর ও সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ ছিলেন অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি। ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদের নাম শুধু ভারতবাসীই নয়, রূপ-রসিক বিশ্ববাসীও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ত স্মরণ কোরে থাকেন।

তাঁর বিশিষ্ট ভাস্কর্য-কর্মগুলির মধ্যে 'শ্রমের জয়-যাত্রা' ও 'আগষ্ট আন্দোলন—১৯৪২' সর্বাধিক জন-পরিচিতি লাভ কোরেছে। 'আগষ্ট আন্দোলন' ভাস্কর্য কর্মটি সম্পর্কে দেবীপ্রসাদের মন্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : "আমরা ক্ষত্রিয়। প্রথম সৃষ্টিটি দেখে আমার মনে হোল সন্তানকে কেউ আঘাত কোরলে তার মা-বাপ যেমন প্রতিশোধ নেন, তেমনি একটা ভাব এই সৃষ্টিটির ভেতর ফুটিয়ে তুললে শিল্পকর্মটি নিশ্চয় যথাযথ হোয়ে উঠবে, তার আসল রূপ প্রদর্শিত হবে। 'মার্চ অব্ দি লাইট ব্রিগেডে'র কথা মনে পড়লো। এই সূত্র নিয়ে একটা 'থিম' লিখে ফেললুম 'অন থ্রি ডায়মেন্শন' যা 'হায়েষ্ট সিভিলাইজ্ড ওয়ার্লড' দিতে পারে। উদ্যোক্তারা আমার কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় শিল্প-কর্মটি নির্মাণের ব্যাপারে একবার, দুবার, তিনবার পর্যন্ত গড়েছি, ভেঙেছি তারপর দাঁড়িয়েছে আসল শিল্পরূপ।" সৃষ্টিটির কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীরায়চৌধুরী আরো বলেন : "বেয়াল্লিশের আন্দোলনে যে-সব বিদ্রোহীরা আত্মোৎসর্গ কোরেছিলেন তাঁদের আত্মোৎসর্গের মূলে ছিল খাঁটি স্বদেশপ্রেম—যাঁরা আত্মদান কোরেছিলেন তাঁরা ছিলেন দেশী, সেই দেশী সুরকেই আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কোরেছি আমার শিল্পকর্মের মধ্যে।" কোলকাতায় গান্ধীজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিটিও ভাস্কর দেবীপ্রসাদের বিশিষ্ট সৃষ্টি। 'শীত যখন আসে', 'ছন্দ'-নামক ভাস্কর্য দুটিও সুপ্রসিদ্ধি লাভ কোরেছে। 'শ্রমের জয়যাত্রা' ভাস্কর্যটি ভারত সরকারের ডাক-টিকিটের প্রতীক চিত্র হিসাবে ব্যবহৃত।

এই বয়সেও তিনি সৃষ্টি সাধনায় নিরলস। প্রতিদিন অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম কোরে থাকেন। তাঁর একমাত্র সন্তান ভাস্কর রায়চৌধুরী। তিনিও পিতার মতো কলাসরস্বতীর পূজারী। ভাস্কর নৃত্যশিল্পী হিসাবে স্বদেশে ও বিদেশে খ্যাতি লাভ কোরেছেন। তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী চারুলতা দেবী আদর্শ সহধর্মিণী ও সুলেখিকা।

(জীবনীর উপকরণ মাসিক বসুমতী থেকে সংগৃহীত।)

দেবীপ্রসাদ-কৃত : অগাষ্ট আন্দোলন।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী লিখিত এই প্রবন্ধটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালের অন্যান্য ভাস্করদের চিন্তাধারার সঙ্গে মতানৈক্য থাকলেও প্রবন্ধটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাস্কর্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে শব্দটির চলতি অর্থে আমরা কি বুঝি। মূর্তিগঠনের প্রণালীতে, প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শে সাদৃশ্য বা পার্থক্য কোথায় এবং চিত্রাঙ্কনের তুলনায় ভাস্কর্যের রূপ-পরিকল্পনা ও তার প্রকাশ কি ভাবে সীমাবদ্ধ। চলতি মতের সমর্থনেই যখন বক্তব্য সুরু কোরেছি তখন ভাস্কর্য বোলতে বিরাট রূপের কথাই আগে মনে আসে, যাকে চাক্ষুষ কোরতে হোলে কঠিন পাথরের চাঁই ফাটিয়ে রূপকারকে ধ্যানস্থ হোতে হয় পাথরের এবং তার নিজের গোপন কথা বার কোরে আনার জন্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধ্বংস-বিলাসী কালের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জন্য সাধনার সাফল্যে পাথরের গর্ভস্থিত রূপ আত্মপ্রকাশ করে। কারণ কালজয়ী হবার প্রয়াসেই পাথর-গঠিত রূপের জন্ম। সাধনার আন্তরিকতায় পাহাড় পর্যন্ত নত হোয়ে যায়। শিল্পীকে তার যাচিত রূপে অর্ঘ দানে ধন্য হয়। রূপান্তরিত অটল পাহাড় প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রে সজাগ হোয়ে থাকে, আজ, কাল ও দূর ভবিষ্যতের মানুষকে সাধনার দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য। ধাতু গঠিত মূর্তিতেও ওই একই রূপ কালজয়ী হওয়ার প্রয়াস বর্তমান। সুতরাং মূর্তিগঠনের উক্ত উপাদানগুলির মাধ্যমে সৃষ্ট রূপের মধ্যে যে বিরাটত্বের প্রত্যাশা থাকে তা ক্ষণভঙ্গুর চিনেমাটির পুতুল, তালপাতার সেপাই, চেপ্‌টা তারের গোলকধাঁধা অথবা ঝাঁটার কাঠি অধিষ্ঠিত উচ্ছিষ্ট আলুর দমের বাহার ইত্যাদিতে আশা করা অসম্ভব। আধুনিক রুচির সমর্থনে ওগুলি ঘরের অত্যাবশ্যক শোভা হোলেও বিরাটের সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার ক্ষীণজীবির তুলনা ভিন্নরুচি মেনে নেবে এমন কথা নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে না।

ড্রইং-এর অনুকরণে চ্যাপটা তারের নক্‌সায় যে গোলকধাঁধাঁর জটিল প্যাচ দেখা যায় তাতে কাগজের উপর হিজি-বিজি আঁকার সাদৃশ্যই বেশী। হেঁয়ালীর

দূরের যাত্রী : ভাস্কর দেবীপ্রসাদ।

আড়াল কাটিয়ে যেটুকু জানা ফর্ম (form)-এর উঁকি বেরিয়ে আসে তাতে ভীতিপ্রদ স্বপ্নের কথা মনে কোরিয়ে ছাড়ে,—যে ভীতির নাগালে সুন্দরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ছবির ক্ষেত্রে এই জাতীয় উৎপাত তেড়ে-ওঠা আধুনিক রুচি সমর্থন কোরলেও অনভ্যস্তের পক্ষে পাঁড়নকে আনন্দের উৎস ভাবা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তারের ভেলকিবাজী এবং উচ্ছিষ্টাংশ ভূষিত মার্জনি আধুনিক মতে অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন হোতে পারে, কিন্তু ঝাঁটার মারকে বরণীয় করায় আমার আপত্তি আছে।

চলতি মত মানতে হোলে, ভাস্কর্যের রূপ-পরিকল্পনায় আয়তনের নির্দেশ ও গঠনপ্রণালীতে যে প্রত্যাশা থাকে তার সঙ্গে ছবির সর্বতং ভাবে মিল সম্ভব নয়। যদিও পরিকল্পনায় উভয়ের উদ্দেশ্য থাকে রেখার ছন্দে রূপকে বাঁধা, কিন্তু যে প্রকরণ দ্বারা রূপকে সীমাবদ্ধ করা হয়, যে রূপের সহায়তায় চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্র-অনুসারে তার আয়তন, শক্তি, উদ্দেশ্য ও অন্যান্য গুণ তুলনা কোরলে দেখা যাবে, বাঁধনের প্রথাতেই পার্থক্য সজাগ হোয়ে আছে রূপের উদ্দেশ্যকে পৃথক কোরে দেবার জন্য।

ঘর সাজান ক্ষণভঙ্গুর ক্ষুদ্রাকার পুতুল ও পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত ভাস্কর্যে বিরাটত্বের দৃষ্টান্তে জাহাজ ও ডিঙ্গির কথা এসে পড়ে। উভয়ের উদ্দেশ্য জলের উপর ভাসা হোলেও ব্যবহার সম্পূর্ণ আলাদা। অথৈ পাথার পাড়ি দিয়ে দূর দেশে যেতে হোলে জাহাজ ভিন্ন গতি নেই। দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের মাঝপথে ঝড়-ঝাপটার সঙ্গে যোঝার শক্তি একমাত্র জাহাজেরই থাকে। খাল বিলের জলচারী ডিঙ্গি চোড়ে কেউ সমুদ্র যাত্রার কথা ভাবে না, অতএব স্বীকার কোরতে হয় আয়তনের পার্থক্যে বিরাটের মধ্যে যে গাম্ভীর্য আসে, দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের সঙ্গে বোঝা পড়ার সর্তে যে রূপকে বাঁধা হয়, তাকে পুতুলের সঙ্গে তুলনা কোরতে যাওয়া বিড়ম্বনা। বাঁধনের দৃষ্টান্তেও তুলনার অভাব নেই। জাহাজ বাঁধা দাঁড় ও ঘুড়ি ওড়াবার সুতোর উদ্দেশ্য বাঁধা হোলেও কাগজের খেলনাকে অতিকায় দাঁড়র সাহায্যে ওড়াবার চেষ্টা কোরলে দাঁড়র ভারেই ঘুড়ি ধরাশায়ী হোয়ে থাকবে, অতএব প্রত্যাশায় যথাযথ প্রয়োগ না হোলে, বিচারে পক্ষপাতিত্ব অথবা অশোভনীয় মীমাংসা এসে পড়া বিচিত্র নয়। এই সূত্রে নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে, একই ধরণে গড়া মূর্তির মধ্যেই আকার ভেদে গুণের তারতম্য এসে পড়ে। তর্কের খাতিরে প্রশ্ন উঠতে পারে, মিনিয়েচার মূর্তি বা ছবিতে কারিগরি নিপুণতা বা সৌন্দর্যের সম্পদ বৃহৎ ছবি বা মূর্তির গুণের সঙ্গে তুলনা কোরলে আকারে ছোট বলেই গুণ নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হবে? এস্‌থেটিক ভ্যালুজকে সেণ্টিমেণ্ট-এর তোয়াজে বড় কোরলে, স্বীকার কোরতে হয়, প্রত্যাশা আপন কেন্দ্র ভ্রষ্ট না হোলে কোন রূপই তুলনায় কারো অপেক্ষা খাটো নয়। সৌন্দর্য মাপার এমন কোনো মাপ কাঠি আজও তৈরী হয়নি যার সাহায্যে কোনো বিচারকে শেষ সিদ্ধান্ত বলা চলে। কারণ বিচারের মধ্যে মূল সম্বল থাকে সাময়িক রুচির প্রভাব যা কোনো না কোনো যুক্তির ঠেকায় আপন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে চলে। অ্যাবসোলুট ট্রুথ বা বিউটি-র নির্দেশ বা ঠিকানা পাওয়া গেলে সুন্দর বা সত্যের সন্ধানই বন্ধ হোয়ে যেতো। সকলের কাছে আরাধ্য বস্তু এক হোয়ে গেলে, উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ভঙ্গীতে বৈশিষ্টোর মামলাও থাকতো না। আবেষ্টনীর পরিবর্তনে ও ঘটনাচক্রের প্রয়োজনীয়তায় রুচিও, পুরাতনকে ছেড়ে নতুনকে ধরছে। এইখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নতুনকে ধরার পিছনে যে তাগিদ থাকে তাতে ব্যক্তিগত মতের বিচার নেই। নিরবচ্ছিন্ন সাময়িক চাহিদার প্রয়োজনে অন্ধ অনুসরণকে আমরা

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী রূপায়িত একটি আবক্ষ মূর্তি।

ধরে নি প্রগতিশীলতার পথপ্রদর্শক। সেণ্টিমেণ্ট-এর কথায় ফিরে আসি। ছোট ও বড়-র গুণাগুণকে তুলামূল্য কোরলে জাহাজ ও ডিঙ্গীর তুলনায় ফিরে যেতে হয়। জাহাজের পরিবর্তে ডিঙ্গীর সাহায্যে সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টায় যে ডুবতে হয়, একথা স্মরণ থাকলে নিষিদ্ধ আচরণ সম্বন্ধে সংযত হওয়ার কোনো বাধা আসে না।

ভাস্কর্য, পুতুল ও ছবির কেন্দ্রীক সীমানার কথা-উঠলো কারণ চৌহুদ্দির দাবীর দাঙ্গায় কেবল ছোট খাটো বেড়া ভাঙ্গার অভিযোগ নেই, বিশ্বাসের মূল সম্পদ, আদর্শের উপরে জুলুম চলায় ঘটনাটি লঘু কোরে দেখা চলে না। প্রাচীন বিশ্বস্ত রুচি ও বিশ্বাসের তরফ নিয়ে যখন দাঁড়িয়েছি তখন কনভেন্‌সন ও অ্যাকাডেমিক প্রিন্সিপ্‌লস সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ডানদিকের পাতায় :
দেবীপ্রসাদ-কৃত তাঁর পিতার মূর্তি

প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শবাদীদের মধ্যে যে ইন্‌-টেলেক্‌চুয়াল দাঙ্গা বেঁধে গিয়েছে তাতে প্রগতিশীল চিন্তার প্রচারকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দাঙ্গাকে ধর্মের স্তরে তুলে ফেলেছেন। দুর্দান্ত ধর্মপন্থীর প্রতাপে প্রাচীন-পন্থী পুরোহিতের অবস্থা শোচনীয় হোয়ে উঠেছে। যে পুরোহিত সারাটা জীবন বিশ্বাসের উপর নির্ভর কোরে দেবতা বা দেবীকে পূজার্ঘ দিয়ে এল। পূজার প্রথায় মন্ত্রের মানে বুঝুক, বা না বুঝুক, মন্ত্র উচ্চারণের ধ্বনিতেই শান্তির সন্ধান যদি পায় তাহোলে কোন অধিকারে ভিন্ন-মতাবলম্বী বিশ্বাসীকে ধর্মভ্রষ্ট করার জন্য উপরোক্ত প্রগতিশীলতার প্রচারকরা দলবদ্ধ শক্তি নিয়ে আক্রমণ কোরতে পারে? বলাই বৃথা, দাঙ্গার মাঝে পেটানোর শক্তিই অধিকারের সূত্র। অধিকার স্থায়ী হোতে চায় ভিন্ন প্রকারের বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে। এখানেও অন্ধ বিশ্বাস চলে অসাড় যষ্ঠির পথ নির্দেশে। পথ চলার দাবীতে ব্যক্তিগত দায়িত্বের প্রয়োজন হয় না। ঠিক যে ভাবে চাঁদার মারে দলের আড়াল নিয়ে যাকে পাওয়া যায় তাকেই ঘা কতক পিটিয়ে দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হোয়ে গিয়েছে।

নববিধানের প্রচারকরা মুক্তি-সেনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁদের প্রধান কর্তব্য দাঁড়িয়েছে বিশ্বাসের শৃঙ্খলপাশ থেকে দুর্বলকে পরিত্রাণ করা। কিন্তু শৃঙ্খলের বাঁধন, স্নেহের বাঁধন, বিশ্বাস ও মায়ার বাঁধন যে এক নয় তা যদি মুক্তিদাতারা বুঝতেন, তাহলে ত্রাণ কর্তাদের ফেরো-সাস্‌ অ্যাটিচুড নেওয়া প্রয়োজন হোতো না। শক্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অসহায় সন্তানকে মাতার ক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কর্তব্য জ্ঞান কঠোর হোয়ে উঠতো না। মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে পুরোহিতের কাছে মাতা এবং ঐ বিশ্বাস যে তার অসহায় অবস্থার ভরসা বিশ্বাসের উপর নির্ভর কোরেই, বিশেষ রূপের পূজারী যে দুঃখের মাঝে সান্ত্বনা খোঁজে তা উগ্র ধর্মের প্রচারকরা উপলব্ধি কোরবেন কেমন কোরে। শক্তির প্রকাশ যেখানে দমন-নীতিকে আদর্শ কোরে তোলে সেখানে ভিন্ন-মতাবলম্বীর ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের বিচার হোয়ে যায় গৌণ।

নতুন চিন্তাধারার অনুসরণে, রূপসৃষ্টির পরিকল্পনা ও প্রকাশভঙ্গী যে ভাবেই আধুনিকতার সম্পদে সমৃদ্ধ হোক, তার জন্ম অতীতের গর্ভে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও পালনের রীতিতে প্রাচীনের দান থাকে যথেষ্ট। যেখানে নাড়ীর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, সেখানে অস্তিত্বের সূত্রকে অবহেলা বা অস্বীকার করাটা সকলের বিবেকে সায় দেয় না। বিশেষ কোরে রূপ ও রসের বিশ্লেষণ ও বিচার যখন রুচির ভিত্তির উপর নির্ভর করে, যে ভিত্তি পুরাতন মসলা দিয়ে তৈরী। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন রুচির আবির্ভাব ও তার অনুসরণে, পুরাতনের পরিবর্তন স্বাভাবিক। কিন্তু প্রচলিত ধারার প্রভাব থেকে নবাগত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হোতে পারে না, কারণ পুরাতন পথই নতুনের দিকে দৃষ্টি ফেরায়, চলার অভিজ্ঞতা দুর্গম নতুনকে জানার সাহস দেয়।

প্রচলিত ধারা বা অ্যাকাডেমিক কন্‌ভেন্‌সন বোলতে ঘরোয়া দাবিকে একমাত্র সম্বল ভাবি নি, বাইরে থেকে যে সব প্রভাব এসেছে এবং দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠতার ফলে যারা একান্ত আপনার হোয়ে গিয়েছে তাদেরও ঘরোয়া কন্‌ভেন্‌সন-এর অন্তর্ভূত কোরেছি। অতীতের নথি, অর্থাৎ ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই প্রমাণ হবে, কৃষ্টি বা বাণিজ্যের কেন্দ্রে, দেশ দেশান্তরে, বিভিন্ন যুগে আদান-প্রদান সহজ গতিতেই চলত নির্বিচারে। বিদেশীর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধতার জাতি-ক্রোধ ছিল না। বরং বাঞ্ছনীয় প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘরোয়া সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখা ছিল ঔদার্যের রীতি।

গান্ধার ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাব, তিব্বতী ছবির রূপ পরিকল্পনায় চৈনিক প্রভাব—এমন কি মিসর দেশে

সমাধি রক্ষিত মামি ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের সঙ্গে কোলকাতার কাঠের পুতুল, মুরশিদাবাদের আরুস কাঠের ছড়ির কারিগরি ও গঠনে সাদৃশ্যের অভাব নেই। ছড়ি ও পুতুলে বৈদেশিক প্রভাব থাকলেও দীর্ঘকাল ব্যবহারে ওগুলি বাংলার সম্পত্তি হোয়ে গিয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সামগ্রীর বহু গঠনে বৈদেশিক উৎপত্তির ছাপ থাকলেও দীর্ঘকালের পরীক্ষায় যে উপকারিতা পাওয়া গিয়েছে তাতে সেগুলিকে অপরিহার্যই বলা চলে।

ঘরোয়া দাবী সম্বন্ধে বোলতে পারি, প্রাচীন রূপ সৃষ্টির বিধানে যে সংস্কৃতি এসেছিল তাতে শাস্ত্রীয় নীতি অলঙ্ঘনীয় হওয়া সত্ত্বেও, শক্তিশালী শিল্পী নিজের সত্ত্বাকে অস্বীকার কোরতে পারে নি। নীতির বশ্যতা মেনেই নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ কোরেছিল। এই জাতীয় স্বীকৃতির পিছনে শাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল না, পূর্বগত রূপদক্ষের গুণগ্রাহী হওয়ার দরুণ পরের যুগে শিল্পী শৃঙ্খলাবদ্ধ পথ নির্দেশকে নিজের স্বার্থের জন্যই গ্রহণ কোরেছিল। রূপের সঙ্গে রসগ্রাহীর যোগ না থাকলে এই জাতীয় বশ্যতাকে মানা সম্ভব হোতো না। বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনে উক্ত আদর্শে গুণসম্পন্ন হোতে হোলে, স্বাধীনচিন্তা এবং রূপ-প্রকাশের উপকরণকে নির্ভরশীল কোরতে হয় যার দ্বারা যা প্রকাশ্য তাকে আদর্শের বশীভূত করা চলে। পাহাড়কে বশ্যতা স্বীকার করানোর দৃষ্টান্ত আজও ইলোরা, অজন্তা, মহাবলীপুরামে পাওয়া যায়। সুতরাং যে কোন অঙ্কন বা গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করা হোক না কেন, বৈশিষ্ট্যের দাবী কোরতে হোলে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর কোরতে হয়, অন্যথায় গতানুগতিকতার প্রশ্রয়ই এসে পড়ে, নকলনবিসীর পারদর্শিতায় শিল্পী বৈশিষ্ট্য লাভ করে। শৃঙ্খল-মোচনের নববিধান মানতে হোলে নির্বিচারে সকলেই যদি বৈশিষ্ট্যের দাবী পায় তাহোলে বৈশিষ্ট্যই অতি সাধারণ হোয়ে যায়। রূপসম্পদের মূল্যে তুলনার প্রয়োজন থাকে না। এবং তুলনাকে অস্বীকার কোরলে এগিয়ে চলার পথই বন্ধ হোয়ে যায় কারণ যে চলে তাকে এগো-ই চালায়। আমি সেই এগো-র কথা বোলেছি যে নিজের ত্রুটি শোধরাবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে।

এই সূত্রে উপযুক্ত গুরুর উপদেশ প্রয়োজন হোয়ে পড়ে যে গুরু শিষ্যকে স্বাবলম্বী কোরে দূর পথের যাত্রী কোরে দিতে পারে। শিষ্যের সাফল্যের জন্য নিজে পিছিয়ে থাকে। গুরু গৌরবকে তখনই সার্থক মনে করে যখন শিষ্য নিজের পরিচয়ে গুরুকে চিনিয়ে দেয়। কিন্তু যাবতীয় ইজ্‌ম-এর আবির্ভাবে গুরুর পরিচয় এখন লজ্জাকর হোয়ে উঠেছে। খুবই স্বাভাবিক, কারণ আধুনিক নকসায় বা রূপের গঠনে যে চাহিদা থাকে তাতে আদর্শ, শৃঙ্খলা বা সাধনার ছিটে ফোঁটার আভাষ পেলেই নতুন রূপদক্ষ বোলে বসেন, 'দাসত্ব-বৃত্তির ছাপ পড়েছে'। অপর দিকে তাঁরই বিচারে মর্কটের আঁকা হিজিবিজির হুবহু নকল রূপস্রষ্টার আসরে লব্ধ প্রতিষ্ঠের স্থান কোরে দেয়। এটাও স্বাভাবিক কারণ বাঁদর-প্রদত্ত নকসা উদ্দেশ্যহীন। সে রূপের কোন মানে হয় না। প্রয়োজনও নেই। মানের অর্থে কোন বস্তুব্যের প্রকাশ যা গল্প ঘাড়ে নিয়ে ঘোরে, সোজা কথায় মোট-বাহক। নকসার ভাল মন্দের প্রশ্নও অবান্তর কারণ তার রূপ সাদৃশ্যহীন অতুলনীয়, হঠাৎ দৈব কৃপায় পাওয়া, চেষ্টা লব্ধ ফল নয়। সংক্ষেপে হিজিবিজি। আপন রূপেই স্বতঃসিদ্ধ।

রূপ যদি মূর্তি অথবা ছবিতে ভাবের বার্তাবাহক হয়, শিল্পীর কোনো বিশেষ উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করে তাহোলে প্রকাশের উদ্দেশ্যকে অর্থহীন করা সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে সম্ভব নয়—কারণ উচ্ছ্বাসকে কাউকে জানানোর জন্যই প্রকাশ কোরতে হয়। সুতরাং বক্তব্যকে

বুঝতে হোলে, নকসার পাঠোদ্ধার কোরতে হোলে ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। প্রত্যাশিত সর্তের অভাব থাকলে, উচ্ছ্বাস বা বক্তব্য বাতুলের প্রলাপই প্রতিপন্ন হয় তার বেশী কিছু নয়। শিল্পীও হয়তো এক প্রকারের পাগল কিন্তু তার পাগলামি বুদ্ধি-হীনতার পরিচায়ক নয়। সে ঠিক জানে কোন ভাষার সাহায্যে কার কাছে কি বোলতে হয় এবং বলার প্রতি-ক্রিয়ার জন্যও সে ব্যগ্র হোয়ে থাকে। সুতরাং রসগ্রাহী না পেলে যে শিল্পীর ভাবোচ্ছ্বাসও বেকার হোয়ে যেতে পারে সে বিষয় সন্দেহ করা চলে না।

ভাব-অভিব্যক্তি যে প্রথাতেই প্রকাশিত হোক তার উদ্দেশ্য ও অর্থকরণের প্রয়োজন না থাকলে বুঝতে হয়, 'এফেক্ট উইদাউট কজ অ্যান্ড পারপাজ'-এর অন্তরালে এমন একটি জটিল তত্ত্ব জড়িয়ে আছে যার সম্যক্ উপলব্ধি সহজ বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়। মানলাম অবোধ্য রূপসৃষ্টি আজকের মানুষের জন্য নয় কিন্তু বর্তমানকে অবহেলা কোরে ভবিষ্যৎকে তুষ্ট করার চেষ্টাও ব্যর্থ হোতে পারে যদি রূপসৃষ্টির উদ্দেশ্যে গুণের কোন সম্পর্ক না থাকে। শূন্য আধারকে অমূল্য সম্পদ তারাই ভাবতে পারে যারা মাটির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না।

এতটা লেখার পর প্রবন্ধ রচনায় গোড়ার কথা মনে পড়লো। অনধিকার চর্চায় নামার ইচ্ছা ছিল না, বিশেষ কোরে বক্তব্য বিষয় যখন ভাস্কর্যকে নিয়ে। শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অখ্যাতির সংঘর্ষে কাবু হোতে বসেছি, তার উপর সমালোচনায় নামলে, যে ডালে বসে আছি সেই ডালই কাটতে হয়। শেষটায় ডাল থেকে পতন সুখপ্রদ হবে না জেনে সম্পাদক মহাশয়কে অপারগতার কথা লিখেছিলাম। বন্ধুবর রসিক মানুষ, উত্তরে জানালেন, সামনের দিক না কেটে পিছন দিকে কুড়ুল চালাও এবং বক্তব্যকে ঘুরিয়ে নাক দেখানোর প্রথায় উপযুক্ত স্থানে মোড় ফেরাতে থাক। ফলে আছাড়ও খাবে না এবং বক্তব্যও ঘুরে ফিরে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছোবে।

প্রস্তাবের পিছনে কতোটা রসিকতা এবং কতটা রূঢ় সত্যকে খুঁচিয়ে দেখার ইচ্ছা ছিল বোলতে পারি না। পিছন দিকে কুড়ুল চালাতে হোলে হাতের মত অঙ্গকে তাহা সঙ্গত স্থান থেকে উচ্ছেদ কোরতে হয়। দৃষ্টির স্বাভাবিক ব্যবহারও কাজে আসে না। পিছন দিকে দৃষ্টি পেতে হোলে উল্টো দিকে দেখার জন্যই দিব্য-দৃষ্টির প্রয়োজন হোয়ে পড়ে। রূপ দর্শনের ব্যাখ্যায় যাদের নিয়ে পড়েছি তাদের সঠিক পরিচয় দিতে হোলে, রূপের অন্তর্নিহিত সত্যকে বার কোরতে হোলে দিব্য-দৃষ্টির প্রয়োজন আছে বোলেই মনে হয়। এদিক দিয়ে আমি বঞ্চিত। সুতরাং আমার বিবরণকে সহজ দৃষ্টির উপর আস্থা রেখেই চালাতে হবে।

রূঢ় সত্যকে খুঁচিয়ে দেখার চেষ্টায় কিউবিজম্, ইম্‌প্রেসনইজম্, ডাডাইজম্ ইত্যাদি টপকে যখন অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের আওতায় এসে পৌঁছালাম তখন ঘুরিয়ে নাক দেখানোর চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত সামনে পাওয়া গেল। একটি মাঠ জোড়া পাথরের শাঁক আলু। মাঝখানে বৃহৎ গর্ত। শূন্য স্থানটির প্রতি দৃষ্টি কিছুক্ষণ আবদ্ধ হোতেই দেখলাম গহ্বরের আয়তন বেড়ে চলেছে। ক্রমান্বয়ে গহ্বরের শূন্য ও অসীম একাকার হোয়ে গেল। রূপ অরূপে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কোরতে লাগলাম বোধ শক্তি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল প্লেন্-এর দিকে পা বাড়িয়েছে। ফাঁপরে পোড়ে গেলাম। কৃষ্টির একটা বিশিষ্ট দিক নিয়ে আমার কারবার, বুঝি না বলারও সাহস নেই। মূর্তির আবার একটা নামও আছে। ভাব-ব্যঞ্জক নাম। সোজা উল্টো সব দিক দিয়ে দেখলাম, বিরাট আকারেও শাঁক আলুর বহিঃদর্শ্যের রূপ ভাব-ব্যঞ্জক নামের সঙ্গে যোগ ঘটাতে পারল না। অন্তর্নিহিত

সত্যের মধ্যেও তো ঐ গহ্বর ও অসীম শূন্য। শূন্যকেই সৌন্দর্যের সম্পদ ভেবে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল গ্লেন থেকে নেমে এলাম, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ভাস্কর্য যে রূপ নিয়েই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন তাকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে মানতে হোলে, জ্ঞাত রূপের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং তুলনার অন্তর্ভূত কোরতে হয় যার অভাবে কোন গুণেরই বিচার সম্ভব হয় না। সাদৃশ্যের প্রশ্নে বাস্তবের অভিজ্ঞতা জড়িয়ে থাকে। বাস্তব বোলতে কেবল প্রত্যক্ষের উল্লেখ করি নি, উপলব্ধিকেও অপরিহার্য ভাবি, যেমন হাওয়া, যা দেখা যায় না কিন্তু অনুভূতিতে বাতাস একান্তই বাস্তব। তার বিভিন্ন গতি আছে। ঝটিকার রূপ নিলে বিরাট বটকে ধরাশায়ী কোরে ছাড়ে। গাছের উপর গতির প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি, বায়ুর মহাশক্তি বুঝি। বসন্তের মৃদু সমীরণে, দেখি আনন্দে উৎফুল্ল রঙীন ফুলের দোলা। গতির প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর না হোলেও নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে হাওয়ার অস্তিত্বকে অস্বীকার কোরতে পারি না। সব কয়টি ঘটনাতেই অদৃশ্য বায়ুর সঙ্গে বাস্তবের প্রত্যক্ষ রূপের যোগ থাকায় বায়ুর গুণ বিচারে কোন অসুবিধা আসে না। অদৃশ্য বায়ুর মতই বিভিন্ন উচ্ছ্বাসের উৎস অন্তরে কিন্তু তার উৎপত্তি ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সাদৃশ্য ও তুলনামূলক। যেমন রাগ, দুঃখ, হাসি, কান্না, ক্ষোভ। সব কয়টিরই প্রকাশ রূপায়িত হোয়ে ওঠে কোনো বিশেষ ঘটনার অবলম্বনে। সব কয়টিই রূপগ্রহণ করে মানুষের আশ্রয়ে। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মুখাবয়বে যে ভাবের আবির্ভাব হয় তা উচ্ছ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। বাস্তব-জাত প্রত্যক্ষরূপের সঙ্গে কাল্পনিক রূপের অন্ততঃ খানিকটা সাদৃশ্য না থাকলে ভাবের গুণাগুণকে বিচার করা চলে না কারণ বিচারের মূল সহায় তুলনা যাকে সাদৃশ্যের উপর নির্ভর কোরতে হয়। যেখানে সাদৃশ্যেরই অস্তিত্ব নেই সেখানে তুলনা সম্ভব হয় কেমন কোরে। তা ছাড়া সুন্দর বলি কাকে? নিশ্চয় কোন বিশেষ ভাব বা নক্‌সা নয়, কারণ রূপ সৃষ্টির প্রকরণে যাকে সুন্দর বোলে ধরা হয় তা নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশভঙ্গীর কলাকৌশল। এইখানেই শিল্পী, বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হোয়ে থাকে। অতএব গঠনের প্রতিক্রিয়ায় যা সুন্দর হোয়ে ওঠে তাকে মানতে হোলে রূপের উপযুক্ত প্রকাশ ও তার উদ্দেশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না সার্থক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নক্‌সা হোঁয়ালী হোয়ে থাকে। এতে ঘুরিয়ে নাক দেখানোর বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে কিন্তু রূপসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুন্দরকে কাছে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সহজ বুদ্ধির বিচারের সঙ্গে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল মতের দাবী, তুলনা কোরলে দেখা যাবে রূপ যখন অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌সন-এর আড়াল নিয়ে সীমার মধ্যে অসীম হোতে চায় তখন সহজ উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে হিসাব এসে পড়ে। সহজ উচ্ছ্বাসকে হিসাবের শাসনে দণ্ড দিলে, হাসিকে মুখ ভ্যাংচানী ভাবা অস্বাভাবিক নয়।

অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট আর্ট-এর বৃহৎ উদাহরণ, কথাহীন সঙ্গীতের ধ্বনি। আমাদের প্রাচীন প্রথায় (ক্ল্যাসিক্যাল) বিভিন্ন উচ্ছ্বাসের প্রকাশ হয় নির্দিষ্ট রাগ-রাগিণীর দ্বারা। প্রত্যেকটি রাগ বা রাগিণীর প্রকাশের প্রথা ও সময় নির্দিষ্ট। ধ্বনিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সারেগমের প্রয়োজনা জানিয়ে দেয় কোন সুরের আলাপ চলেছে, কোন সুর কি ভাব ব্যক্ত কোরছে, সুতরাং ধ্বনি অদৃশ্য হোলেও সুরের মাধ্যমে বিশেষ উচ্ছ্বাসের রূপ চাক্ষুস হোয়ে ওঠে। সুরের মাধ্যমে রাগ-রাগিণীর ব্যাখ্যার

ভ্রূকুটি কুটিল জরার সার্থক রূপায়ণ।
ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

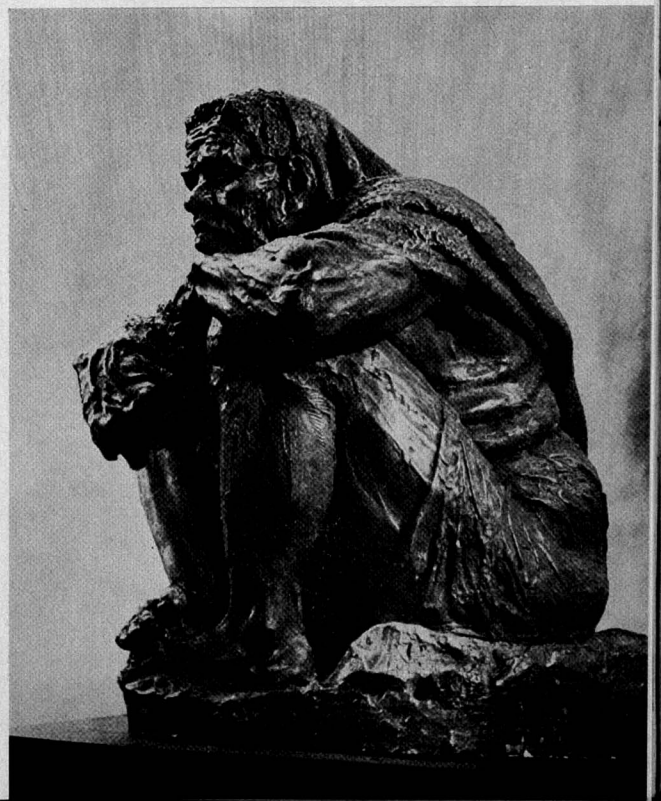

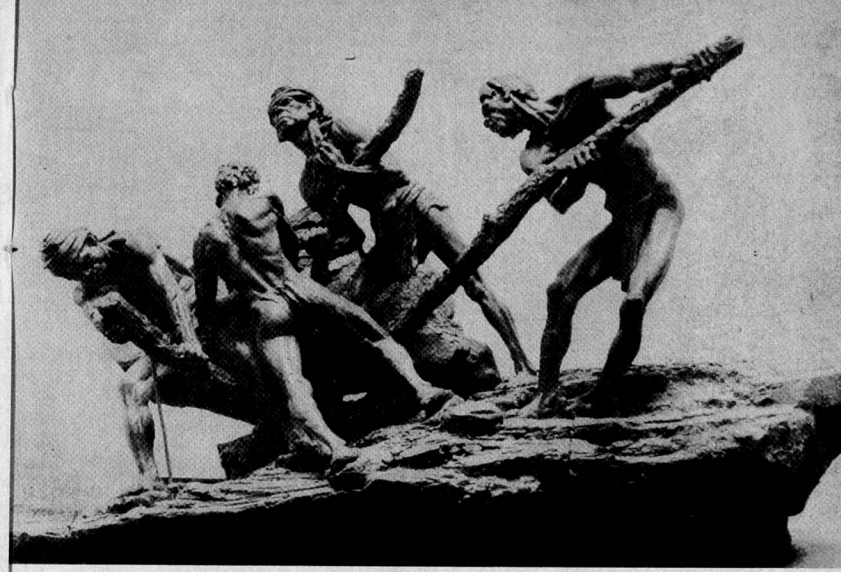

শ্রমের জয়, শক্তির মহিমা এই ভাস্কর্যটির বিষয়বস্তু। ভাস্কর্যটির রূপকার বিখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। বহুল প্রশংসিত এই ভাস্কর্যটি ডাকটিকিটের প্রতীক চিত্র হিসাবে ব্যবহৃত।

সঙ্গে বাস্তবজড়িত অভিজ্ঞতার যোগ থাকায় ধ্বনির রূপ সুররসিকের কাছে অর্থ ও উদ্দেশ্য-পূর্ণ। কথার যোগে সুরকে প্রাণস্পর্শী করার চেষ্টায়—সুর শুধু ভারাক্রান্ত হোয়ে পড়ে না, তার একাধিপত্যের সর্তে ভাগীদার এসে পড়ায় কোলাহলের সৃষ্টি হয়, ভাগের মা গঙ্গা পায় না। যারা সাহিত্যকে টেনে আনে, সেণ্টিমেণ্টালইজ্‌ম-এর জুলুম চালাবার জন্য ব্যস্ত—তারা সুরের প্রতি সশ্রদ্ধ নয়। তারা রূপের মালিক ছেড়ে অলঙ্কারকেই বড় কোরে দেখে—ছবির রূপ বাদ দিয়ে বাহারী ফ্রেম দেখার মত। কিন্তু যারা সুরের ভাষা, বক্তব্য ও তার উদ্দেশ্য বোঝে, সুরের সান্নিধ্যে আত্মহারা হোতে চায়, তাদের কাছে অনাহূত বাড়তি কথা পীড়াদায়ক। নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনির মাধ্যমে সুরের রূপকে জানতে হোলে, তার নিজস্ব রূপকে সুন্দর বোলে স্বীকার কোরতে হোলে, রাগ-রাগিণীর আলাপ শুনতে হয়, সুরকে গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত কান তৈরী কোরতে হয়—অন্যথায় আলাপের মাঝে 'থামলে বাঁচি'র প্রশ্ন উঠে পড়ে। ধ্যানমগ্ন, সুর ব্রহ্মোবিলীন সুরস্রষ্টার তন্ময়তাকে যারা এইভাবে বিঘ্নস্থ কোরতে পারে তারা কৃপার পাত্র। কারণ সুর সম্বন্ধে তারা জন্মবধির, অজ্ঞতাই তাদের গৌরবের সম্পদ। ধ্বনি অদৃশ্য হোলেও সুরের ব্যাখ্যায় তার রূপকে যে প্রত্যক্ষ করা চলে তা আশা করি যুক্তি সমর্থন কোরবে। বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর সূত্রে সুরকেও স্তর-ভেদে বিভক্ত করা চলে রূপের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য। সুরের মধ্যেও সহজ ও গাম্ভীর্যের পার্থক্য আছে। যেমন ধ্রুপদ চালে মালকোষ রাগ সুরজ্ঞের অন্তরে যে উচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি তোলে তা টপ্পা, গজল, বাউল বা ঠুংরীর চালে সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়া আলাদা। ভারী ও হাল্‌কার পার্থক্য স্বীকার কোরলে যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসকেও মানতে হয়।

বিশ্বাসের যুক্তি টেনে বোলতে চাই, অত্যুগ্র আধুনিকতার প্রতাপের কাছে যদি প্রাচীনপন্থীর বিশ্বাস নত না হোতে চায়, জীবনব্যাপী সাধনায় ফলকে যদি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ফ্যাসানের জিম্মায় রাখার অসুবিধা থাকে, তাহোলে দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃষ্টির অবদান, যা উত্তরাধিকারী সর্তে পাওয়া গিয়েছে তাকে সাময়িক উত্তেজনা শান্ত করার প্রয়াসে বর্জনীয় ভাবা, যুক্তি-সঙ্গত কিনা বিচার-সাপেক্ষ হওয়া উচিত।

বিচারের স্মরণাপন্ন হোলাম এই ভেবে, যে, যাঁরা প্রগতিশীলতার পতাকা উড়িয়ে সামনে আগুয়ান হবার দাবী করেন তাঁরাই পিছিয়ে পোড়ে অতীতের সমাধী খোঁড়েন রত্ন আবিষ্কারের জন্য। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, চোরাই রত্নকেই নতুন ছাঁচে ঢেলে আধুনিক বোলে চালানোয় কিছুমাত্র সংকোচ আসে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অঙ্কিত গুহাচিত্রের প্রভাব কোন আধুনিকপন্থী নেতার (বৈদেশিক) কাজে পাওয়া যায়। ছবিটির বিষয়বস্তু মেক্‌সিকো দেশে ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই।

সমৃদ্ধ অতীতের দান নিয়ে যখন আধুনিক গরীব নিজেদের ধনী বোলে প্রচার করেন তখন জহুরীর কাছে উক্ত চেষ্টা হাস্যকর হোয়ে ওঠে। শেষ কথা এই,—যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের চেয়ে বড় পথপ্রদর্শক আর কেউ নেই। সুতরাং দাপটের দাবী ছেড়ে যদি বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহোলে দাবীর সর্তে কোলাহল আসে না। সাধনায় একাগ্রচিত্ততা সুন্দরের সাধনায় শিল্পীকে বিভোর কোরে রাখে। আশা করি প্রাচীনপন্থীর আবেদন ব্যর্থ হবে না।

চিত্রাঙ্কনরত শিল্পী অসিতকুমার হালদার।

ভাস্কর্যকলা

অসিতকুমার হালদার

অসিতকুমার হালদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

কোলকাতা থেকে নাতিদূরে জগদ্দল অঞ্চলে হালদার-দের আদি নিবাস। কেনারাম হালদারের পুত্র রাখালদাস হালদার—যিনি প্রায় শত বর্ষ আগে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত কোরে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল কোরেছিলেন। রাখালদাসের আগে কোনো ভারতীয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পান নি। এই রাখালদাস হালদারের বড় ছেলে সুকুমার হালদারও শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কম দক্ষতার অধিকারী ছিলেন না। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষ। সুকুমার হালদার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হোয়েছিলেন সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে। সুপ্রভা দেবীর গর্ভে আঠারশো নব্বই সালের দশই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে অসিতকুমারের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ হোলেন অসিতকুমারের মাতৃ-মাতুল।

কর্মজীবনে সুকুমার হালদার ছিলেন ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট। কর্মব্যপদেশে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে বাসা বাঁধতে হোত। বালাজীবনে বাবার সঙ্গে অসিতকুমারকেও ঘুরতে হোয়েছে অনেক জায়গায়। পাঠ গ্রহণ কোরতে হোয়েছে বিভিন্ন স্কুলে। নিতান্ত শৈশবে পটশিল্পী ঝড়েশ্বর চক্রবর্তীর কাছ থেকে প্রথম অঙ্কন বিদ্যার সুরু। অচিরাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণে ছেদ ও সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে যোগদানপূর্বক অবনীন্দ্র-নাথের শিষ্যত্ব-গ্রহণ। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন আচার্য নন্দলাল বসু। তার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যেই অসিতকুমার ও স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথকে বরণ কোরেছিলেন গুরু রূপে। ছয় বৎসরকাল শিল্প-শিক্ষার্থী হিসাবে থাকবার পর শিল্প-বিদ্যালয় ত্যাগ ও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উৎসাহে শান্তিনিকেতনে গমন করেন অসিতকুমার। তখনকার শিশু-বিভাগের (১৯১২) ছাত্র ধীরেণ বর্মণ, মণি গুপ্ত, অন্নদা মজুমদার প্রভৃতি নিয়ে ছবি-আঁকা শেখাতে আরম্ভ করেন। কলা-ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন অসিত-কুমার এবং তার গোড়াপত্তন তিনিই করেন।

তৎকালে রবীন্দ্রনাথের যে-সব নাটকের অভিনয় হোয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটির অভিনয়ে অসিতকুমার অংশগ্রহণ কোরেছেন শুধু তাই নয়, মঞ্চসজ্জার সমূহ দায়িত্ব তাঁর উপরই নাস্ত থাকতো।

অতঃপর, উনিশশো তেইশ সালে, ভারতীয় শিল্প-কলা ও বিদেশী শিল্প-কলার পার্থক্য অনুধাবন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সাগরপারে পাড়ি দিলেন তিনি। তথায় তদানীন্তন দিক্‌পাল শিল্পীদের সান্নিধ্য-লাভ ও বিখ্যাত সংগ্রহশালাগুলি পরিদর্শন তাঁর শিল্পী-জীবনের বিশিষ্ট পর্যায়।

বিদেশ থেকে ফিরে প্রথমে জয়পুরের রাজকীয় শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষরূপে পরে লক্ষ্ণৌর সরকারী শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে ঐ একই পদ অলঙ্কৃত কোরলেন অসিত-কুমার। বৃটিশ ভারতে অবস্থিত কোনো সরকারী শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে ভারতীয়দের মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রথম নিযুক্ত হন তিনিই।

শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদানেরও আগে থেকে অসিতকুমারের আঁকা ছবিগুলির প্রধান উপজীব্য ছিল পৌরাণিক কাহিনীসমূহ।

অসিতকুমারের বিশিষ্ট ধারায় আঁকা বিখ্যাত ছবি-গুলির মধ্যে কুণালের চক্ষুলাভ, বর্ধা লক্ষ্মী, আপদ বিদায়, ওমর-খৈয়াম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া বত্রিশটি ছবির সাহায্যে চিত্রে ভরতের ইতিহাস রচনা কোরেছিলেন তিনি।

তাঁর আঁকা ছবির বিষয়বস্তু অবলম্বন কোরে গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন (যথা—তুমি যে সুরের আগুন, আসা-যাওয়ার মাঝখানে, মারের সাগর পাড়ি দেব, একলা বসে, পাতার বাঁশি প্রভৃতি)। এরূপ সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

শিল্পক্ষেত্রে অসিতকুমারের সবচেয়ে যা বড়ো অবদান তা হোল লাক্ষা-রঞ্জিত কাঠের উপর ছবি-আঁকার প্রবর্তন করা। এ-রীতির তিনিই প্রবর্তক।

চিত্রসমূহ ছাড়া কতকগুলি মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্রাকৃতি ভাস্কর্যও তাঁর অনন্য শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন।

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মৃৎশিল্পীদ্বয় যদুপাল ও বঙ্কেশ্বর পাল তাঁর ভাস্কর্য শিক্ষার প্রথম গুরু। পরবর্তীকালে ভাস্কর লিওনার্ড জেনিংসের কাছে ভাস্কর্য-বিদ্যা সম্বন্ধে অনুশীলন ও ভারতবরেণ্য ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীকে সতীর্থ হিসাবে লাভ প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

উনিশশো সাতাশ সালে অসিতকুমার রবীন্দ্রনাথের যে মূর্তিটি গড়েন সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি লিখেছিলেন : ইট ইজ ফ্রিডম ফর ইওর স্পিরিট টু কনজিওর আপ এ ভিসন ফ্রম দি ইনার্ট, টু ইলুমাইন ইটস্ এভরি লাইন উইথ দি ফ্লেম অব ইওর ডিভোশন।

অসিতকুমার হালদার-কৃত একটি রূপকর্ম।

অসিতকুমার শুধু চিত্রশিল্পী ও ভাস্করই নন, প্রতিভাবান সাহিত্য-শিল্পীও। মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি অমর কাব্য তাঁর দ্বারা অনূদিত। মৌলিক কাব্য-গ্রন্থ 'মানসকুমার'। কাব্যে 'গৌতমগাথা' ও 'রাজগাথা' (অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর কাব্যরূপ) সৃষ্টি কোরে সাহিত্যকে পুষ্ট কোরেছেন। স্মৃতিকথা-মূলক রচনা 'রবিতীর্থে'। সাহিত্য-জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে যেকথা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য—তা হোচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রসারের ব্যাপক জয়যাত্রার ইতিহাস থেকে অসিতকুমারের নামও বাদ দেবার নয়।

ভারতের শিল্পপথের অন্যতম প্রধান পথিক অসিত-কুমারের মতে আজকের দিনে স্বাধীন ভারত-সরকার শিল্পের প্রসার-কল্পে যে নীতি গ্রহণ কোরেছেন তা কখনই সার্থকতা লাভ কোরতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে শিল্পীর মন এতটুকু তৃপ্তি লাভ করেনি। ভারত-সরকার যেন ক্রমশঃই ভারতীয় চিত্রগুলিকে ইয়োরোপীয় প্রভাবের চিহ্নে ভোরিয়ে তুলছেন এবং জেনে শুনেই এ কাজ তাঁরা কোরছেন। তবে তিনি আশা রাখেন শিল্পক্ষেত্রে সব অমঙ্গল নিশ্চিহ্ন হোয়ে যাবে, মিলিয়ে যাবে, লুপ্ত হোয়ে যাবে, যা কৃত্রিম, যা দূষিত, যা অন্তঃসারশূন্য তার অবসান একদিন না একদিন হবেই হবে।*

*(জীবনীর উপকরণ মাসিক বসুমতী থেকে সংগৃহীত)।

অসিতকুমার-কৃত
একটি মিনিয়েচার
ভাস্কর্যের নিদর্শন

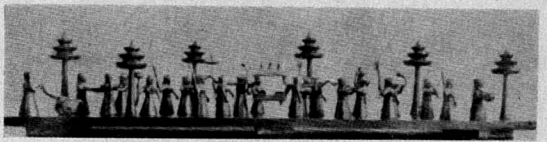

অসিতকুমার-কৃত একটি অভিনব ভাস্কর্য-রূপায়ণ।

মনে পড়ছে উনিশশো ন সালে গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। বলেছিলেন, 'রসগোল্লাটা চাখিয়া দেখ, তাহা মিষ্ট কিনা?' আর্ট চোখ দিয়ে দেখার জিনিস, কথা দিয়ে তাকে বোঝাবার জন্যে যদি বক্তৃতার প্রয়োজন হয়—আর্ট যদি নিজের কথা নিজে না বলতে পারে, তবে তা নিয়ে কারুই মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? অন্য সব আর্টের মতই ভাস্কর্যকলার বিষয়ও এই কথা খাটে। যত বড়ই ওস্তাদ হোন্ না তাঁর গান যদি প্রাণ মাতাতে না পারে—তো সেই গানের যেমন কোন মূল্যই নেই, তেমনি যত বড়ই ভাস্কর হোন্ না কেন—তাঁর গড়া মূর্তিকলা যদি চোখের ভিতর দিয়ে মরমে না পশে, তো তারই বা সার্থকতা কোথায়?

কিন্তু না, এখনকার অ্যাটমিক ধ্বংস-শংকার যুগে সুরুচিপূর্ণ মনোরম জিনিস গড়লে মনঃস্তত্ত্ববিদ্ শিল্প-রসিকদের মনে সায় দেয় না। তাঁরা বলেন ভাস্কর্য যে বস্তু (মেটিরিয়াল) দিয়ে গড়া হোল তার বাহ্য প্রকৃতি (টেক্সচার) যে কী তা যদি জানতে পারা না-গেলো তো ভাস্কর্যকলার সার্থকতা কি আছে? অর্থাৎ তাঁরা চান, কাঠ দিয়ে গড়া হোলে কেঠো হওয়া চাই, পাথর দিয়ে গড়া হোলে মূর্তির পাথুরে ভাব থাকা চাই, মাটি দিয়ে গড়লে মাটির ভাব তাতে বর্তমান থাকা প্রয়োজন। আজ-কাল বিষয়বস্তু নিয়ে তাই আর ভাস্কর্যের জন্যে মাথা ঘামাতে হয় না। এই নূতন রীতি য়ুরোপ আমাদের শেখাচ্ছে। অথচ সকলেই জানেন যে ভাস্করদের কাজ

অসিতকুমার-কৃত রবীন্দ্র-মূর্তি।

আবক্ষ-মূর্তি : রূপকার অসিতকুমার হালদার।

হোল কি বস্তু দিয়ে গড়া হোয়েছে তা দেখানো অপেক্ষা কী বিষয়বস্তু ফোটানোর জন্যে গড়া হোয়েছে সেইটেই দেখানো। যিনি যত বড় ভাস্কর হবেন তিনি ততই নব নব বিষয়বস্তুকেই এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলবেন যে দর্শকের মনে কি বস্তু (মেটিরিয়ল) দিয়ে সেটা গড়া হোয়েছে তার কথা উদয় হবে না। এইখানেই ভাস্করের কলাশক্তি নিহিত।

'শিল্প' কথাটার মধ্যে 'শীলন' শব্দের আমেজ রয়েছে। যে বস্তু দিয়ে গড়া হোয়েছে ঠিক সেই বস্তুটাই যদি অত্যন্ত প্রকট থেকে যায় তো তাতে শিল্পীর 'শীলন' বা সৃষ্টির অনুশীলন গুণই বা থাকছে কোথায়? আদি-কাল থেকে দেখলে, প্রথমে মাটির পুতুল, খেলনা গড়তে গড়তে অনুশীলন দ্বারাই ক্রমে উন্নত ভাস্কর্যকলার আবির্ভাব হোয়েছিল। মাটিটা মাটির মতো রেখে, পাথরটা পাথরের ঢেলার মতো রেখে আদিকালেও মানুষরা ভাস্কর্যের সূত্রপাত কোরেছিল বটে। কিন্তু ক্রমপরিণতির ফলে দেখা যাচ্ছে গড়ার গুণে, কোন ধাতুতে যে গড়া হোয়েছে, দেখলে, তার কথা মনেই আসে না, গড়া জিনিসটাতে তার বিষয়বস্তুর ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাস্কর্যে রূপকল্পনা আমাদের দেশে যা হোয়েছে তার কথা শাস্ত্রে আছে :

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে
দেবোহি বিদ্যতে ভাবে অস্মাৎ ভাবো হি কারণম্।

এতে কাঠ, পাষাণ বা মৃন্ময়ের উপর জোর দেওয়া হয়নি, দিয়েছে বিষয়বস্তুর ভাবে। অতএব, আধুনিক য়ুরোপের বস্তুতান্ত্রিক ভাব দিয়ে দেখলে, দেখতে হয়, কী দিয়ে মূর্তিটা গড়া হোয়েছে; কী গড়া হোয়েছে তা না দেখলেও চলে। এই কারণেই এখনকার ভাস্কর্যকলাকে বোঝাবার জন্যে বক্তৃতা দিতে হয়, তার জন্যে বইও লিখতে হয়। অতীতে ভারতের ভাস্করেরা তাঁদের গড়া ভাস্কর্যকে বোঝাবার জন্যে মল্লিনাথ সৃষ্টি কোরে রেখে যাননি। তাঁদের কাজ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে আজও—যাঁর দেখার চোখ তৈরী আছে তিনিই তার রসাভাস পেতে পারেন। গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথের সেই 'রসগোল্লাটা চাখিয়া দেখ' কথাটাই আমাদের দেশের সনাতনী কথা। আরো একটা কথা বলার আছে, ভারতীয় শিল্পীদের পক্ষে আর্ট ধর্ম ছিল এবং জগতের মাঝে তাই ব্যক্তিগতভাবে নিজের নাম কেনার জন্য আর্ট একটা পন্থা মাত্র ছিল না। তাই তাঁরা তাঁদের কাজের উপর নিজেদের নামটি পর্যন্ত লিখে রেখে যান নি। বহু যত্নে বহু সময় নিয়ে মূর্তি গড়া হোত শুদ্ধচিত্তে ভগবানের আরাধনা কোরে, তাড়াতাড়ি একটা কোনো গঠন (শেপ) দিয়েই হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন না শিল্পীরা। আধুনিক কালে যিনি যত শীঘ্র এবং বেশী মাত্রায় কাজ কোরবেন তাঁরই তত জিৎ। তখন ভারতবর্ষে মন্দিরের গায়ে, গুহার গায়ে ভাস্করেরা মূর্তি গড়তেন। উদ্যানের শোভার জন্য যে ভাস্কর্য তা য়ুরোপের আমদানী ভাস্কর্য। বিষ্ণুপুরাণে আছে :

চিন্ময়স্যাপ্রেময়স্য নির্গুণস্য শরীরিণ :
সাধকানাম্ হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

অর্থাৎ—চিন্ময়, অপ্রেময় নির্গুণ ব্রহ্মকে সাধকেরা সর্ব-সাধারণের হিতের জন্য রূপকল্পনা করেন (মূর্ত করেন)। এখনকার কালে ধর্মবর্জিত (সেকুলার) আর্টে তাই রূপকল্পনার চেয়ে যে বস্তুতে (মেটিরিয়ল-এ) সেটি গড়া হোয়েছে তারই দিকে লক্ষ্য। বস্তুতান্ত্রিক

কেবলমাত্র বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন অসিতকুমার হালদার ভাস্কর্যেও তাঁর অবদান যে যথেষ্ট তার নিদর্শন স্বরূপ এই মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য।

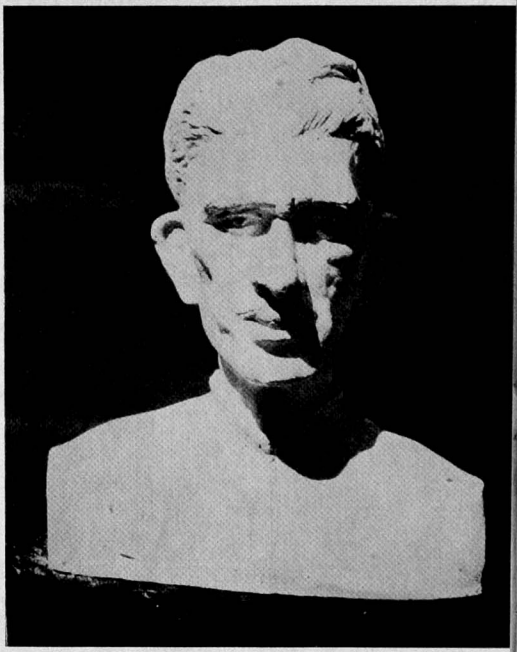

অসিতকুমার হালদার-কৃত আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যের প্রতিলিপি।

(মেটিরিয়ালিস্টিক) আর্টের এই চূড়ান্ত পরিণতি আজ দেখা যাচ্ছে। ঢেলার মতো দুর্বোধ্য কতকগুলি পাথর, কাঠ ও রঞ্জের মূর্তি না-গড়ে-গড়া হোচ্ছে। বিষয়বস্তুর রসমাধুর্য একেবারে উপেক্ষিত।

তা হোক, বেশ তো? ক্ষতি নেই, আর্ট কেবল একপথেই যাবে কেন? কিন্তু ভাবরস (ইমোশান) না জাগলে যে কেবল একটা প্যাটার্ন মাত্র হোয়ে দাঁড়ায় আর্ট? ভাস্কর্য এ-বিষয় সব চেয়ে শক্ত, কেননা তাকে ভাবসম্পদে সম্পূর্ণ কোরতে হয় এমনভাবে যাতে আশেপাশে তার বিষয়বস্তুকে ফোটাতে অন্যান্য কোনো প্রকার জিনিসপত্র দেবার প্রয়োজন থাকে না; এ বিষয়ে যেমন চিত্রকলায় প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভাস্কর্য যেখানে চিত্র, সেখানে তার আশেপাশে অন্যান্য বহু বস্তু দেখিয়ে চিত্রকলার মতই গড়া যায় বিষয়বস্তুর ভাবরস দেখিয়ে। এর তুলনা রয়েছে অমরাবতী, ভারহুৎ এবং সাঁচী রেলিং-এর গায়ে। এই প্রকার একক ভাবে গড়া মূর্তিতে ভাবরস দেবার বিশেষ শক্তি থাকা চাই। বুদ্ধের প্রতিমূর্তি তো বহু স্থানে দেখা যায়, কিন্তু অজন্তার ষোল নম্বর গুহার ধ্যানী বুদ্ধ, সারনাথের ধ্যানী বুদ্ধ এবং সিংহলে অনুরাধাপুরে ধ্যানী বুদ্ধের মতো আর কটা এমন ভাবময় রূপের বুদ্ধ দেখা যায়? ভাস্কর্যে যে প্রতীক (সিম্বল) বিষয় আছলা কোরে আধুনিক শিল্পীরা ভাস্কর্যে কসরৎ করেন, এদেশে তার প্রয়োজন নেই, কেননা স্বয়ং পুরীর জগন্নাথ প্রভুই এ বিষয়ে একাই একশো।

ভাস্কর রূপ গড়েন—ভাবের রস-গীতি পাথরে, মাটিতে বা কাঠে জাগানোর জন্যে। কি জিনিসের উপর গড়বেন তার বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে নয়। ভাস্কর গড়েন রূপ, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে থেকে রস গ্রহণ ক্বারা, প্রকৃতির বিকৃতি করার কাজ তাঁর নয়। ভাঙে, অর্বাচীন নতুন কিছু গড়তে পারে না বোলে—গড়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই। আমাদের দেশের ভক্ত শিল্পীরা জানতেন :

যথাকৃতির্গুণাস্তত্র, নির্গুণঃ পরমেশ্বরো।

যেখানে আকৃতি সেখানেই গুণ বর্তমান, আর পরমেশ্বরই নির্গুণ তাঁকে ধরা ছোঁয়া যায় না।

হিরণ্ময় রায়চৌধুরী-কৃত একটি অনবদ্য ভাস্কর্য।

ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সে-সময় মড্‌লিং করবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিলনা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে। হ্যাভেল সাহেব অধ্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষ। উনিশশো পাঁচ সাল।

ছেলেটি ড্রইং ও পেণ্টিং-এর ছাত্র। কিন্তু সময় পেলেই মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে বসে। মনটা যেন ওইদিকেই পড়ে আছে। মূর্তি গড়তে গিয়ে তন্ময় হোয়ে যায়। ভুলে যায় বাইরের জগতের কথা।

ছেলেটির মড্‌লিং-এ তীব্র অনুরাগ দেখে হ্যাভেল সাহেব তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা কোরে দিলেন। অরূপকে রূপময় করার অভিলাষ অনুকূল পরিবেশে উল্লসিত কোরে তোলে তরুণ শিল্পীকে।

ঠিক এই সময়, ভারতসরকারের আমন্ত্রণে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ভাস্কর লিওনার্ড জেনিংস এলেন কোলকাতায়। গভর্নমেণ্ট হাউস-এ নিজের স্টুডিও-য় বোসে কাজ-কর্ম করেন।

আর্ট স্কুলে সেদিন বিশেষ উত্তেজনা। লিওনার্ড জেনিংস এসেছেন স্কুল পরিদর্শনে। চমৎকৃত তিনি অবনীন্দ্র-হ্যাভেল সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত-শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা দেখে। আর? আর চমৎকৃত কোরলো তাঁকে সেই তরুণ শিল্পীর কতকগুলি মূর্তি।

অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে নিযুক্ত কোরলেন তাকে তাঁর সহকারী হিসেবে। যেমন প্রখর দাবদাহের পর নেমে আসে অফুরন্ত বর্ষণ, রোমাঞ্চিত হয় তৃণভূমি তেমনি ভাস্কর লিওনার্ড জেনিংস-এর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হোতে পেরে রোমাঞ্চিত হোল এই তরুণ শিল্পী। এর পর ভাস্কর্য-কলার ক্ষেত্রে শোনা গেল একটি নতুন নাম। হিরণ্ময় রায়চৌধুরী।

আজ থেকে আটাত্তর বছর আগে যশোহর-খুলনা

কর্মরত হিরণ্ময় রায়চৌধুরী।

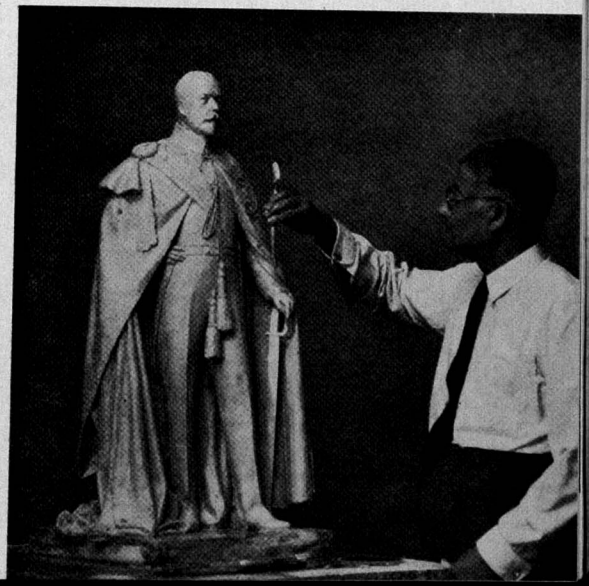

কিশোরী মেয়ের মূর্তি : ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী।

জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে জন্ম হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর। বাবা কৃষ্ণভূষণ রায়চৌধুরী ছিলেন একজন উঁচু দরের শিল্পী। ড্রইং ও পেণ্টিং ছাড়া স্টিল এন্‌গ্রেভিং, আইভরি ওয়ার্ক, কার্পেনট্রি, লিথোগ্রাফি ইত্যাদিতে কৃষ্ণভূষণের সুদক্ষতার কথা সর্বজনবিদিত। হিরণ্ময়ের শিল্প-প্রতিভার মূলে বাবার প্রভাব অনস্বীকার্য।

জেনিংস-এর কাছে এক বছর শিক্ষালাভান্তে হিরণ্ময় নন্দলাল বসু অঙ্কিত রাসলীলা, দানলীলা, তাণ্ডব নৃত্য ইত্যাদি বিখ্যাত ছবিগুলিকে রিলিফে রূপায়িত করেন। সেগুলি কেবলমাত্র পুনর্জাত নয়—পুনর্নবত্বে উজ্জ্বল। (বর্তমানে এই কাজগুলি রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে রয়েছে)। কাজগুলি দেখে তদানীন্তন গভর্নর স্যার বেকার এতোই খুশি হন যে তাঁকে পুরস্কার-স্বরূপ একটি বৃত্তি দেন।

কিছুকাল পরে, শিল্প-দরদী রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শিল্প-শিক্ষার্থী হিসাবে লণ্ডন যাত্রা হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর জীবনে এক বিশিষ্ট ঘটনা। লণ্ডনে রয়েল কলেজ অব আর্টস-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করায় সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি পতিত হোল হিরণ্ময়ের ওপর।

শিক্ষাকালে প্রফেসর এডোয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বছর থেকে মার্বেল কার্ভিং, ব্রোঞ্জ কাষ্টিং ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ও রয়েল কলেজ অব আর্টস্‌-এর এ, আর, সি, এ, ডিগ্রি লাভ ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীকে গৌরবের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিল। কেননা, তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই ডিগ্রি লাভে সক্ষম হোলেন। এখানে উল্লেখ্য যে লণ্ডন যাবার সময় অবনীন্দ্রনাথ হিরণ্ময়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্রোঞ্জ কাষ্টিং ও পটারি শিখতে। বলা বাহুল্য তিনি তা যথার্থই পালন কোরেছিলেন।

উনিশশো চোদ্দ সাল। প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে দিকে দিকে। লণ্ডনে রয়েছেন তখন হিরণ্ময়। তুলি, হাতুড়ি, ছেনি একপাশে সরিয়ে রেখে শিল্পী-দেরও ধরতে হোল বন্দুক, কোরতে হোল নানাবিধ কাজ। ভারতীয় সেনাদলের অ্যাম্বুলেন্স বিভাগে যোগদান কোরে মানুষের জীবনকে তার বাস্তব ঘনিষ্ঠতায় আরো নিবিড়ভাবে দেখবার সুযোগ এলো শিল্পী হিরণ্ময়ের। দীর্ঘ দিন তুলি-হাতুড়ির সংস্পর্শ ছেড়ে থাকতে পারলেন না তাই যাত্রা কোরলেন ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে। শিল্পীর স্বর্গ 'সব পেয়েছির দেশ ফ্রান্স'। নিজের শিল্প-উৎকর্ষ কতখানি তা যাচাই কোরে নেওয়ার ইচ্ছেটাই হয়তো-বা ছিল অবচেতনায়। নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিল্প-আন্দোলনের ঢেউ স্পর্শ কোরেছিল তাঁর মন।

উনিশশো পনের সালে যুদ্ধ শেষ হোলে হিরণ্ময়ের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী যে ভারত সেই ভারত দর্শনই হোল তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। দেশে দেশে ঘুরে অনুধাবন কোরলেন এ-দেশের মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃতির ধারাটিকে।

পর্যটন শেষে কাশ্মীরের একটি ছোট আর্ট স্কুলের শিল্প-শিক্ষক হিসাবে দেখতে পাই হিরণ্ময়কে। এই আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের অভব্য ব্যবহারের প্রতিবাদ কোরে চাকরী ছেড়ে দিলেন অল্প দিনের মধ্যেই। তারপর কাশ্মীর থেকে কোলকাতায়। পুনশ্চ রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বদান্যতায় তৈরী হোল তাঁর নিজস্ব স্টুডিও। এই সময় এখানকার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন যেগুলি কোলকাতার স্থান-বিশেষে সুরক্ষিত দেখতে পাওয়া যাবে আজো।

কোলকাতায় অবস্থানকালে অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশ-ক্রমে অধুনা স্বনামধন্য ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রকৃত গুরুর সাহচর্যে অনু-প্রাণিত হোলেন তরুণ দেবীপ্রসাদ। হিরণ্ময় জীবৎকালে মনে প্রাণে বিশ্বাস কোরতেন যে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দেবীপ্রসাদই একমাত্র শিষ্য যাঁর মধ্যে সত্যিকারের শিল্প-নিষ্ঠা দেখা গিয়েছিল সুরু থেকেই।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্যু হোল। তাঁর মূর্তি গড়বার উপযুক্ত ভাস্কর সন্ধানের জন্য সারা ভারতের ভাস্করদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয় যে প্রতি-

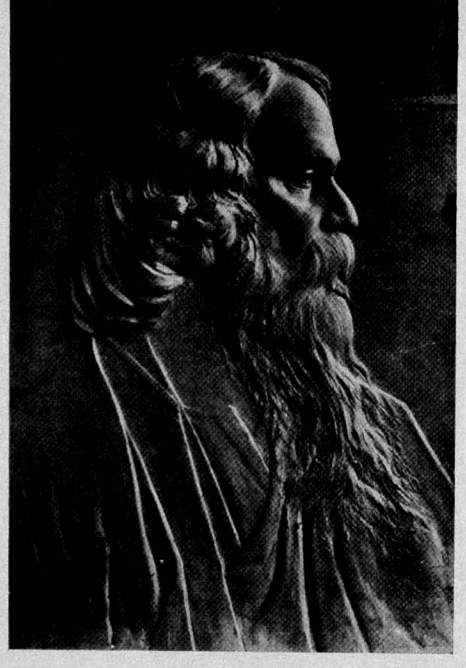

রবীন্দ্রনাথ। ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী-কৃত বিশিষ্ট ভাস্কর্য।

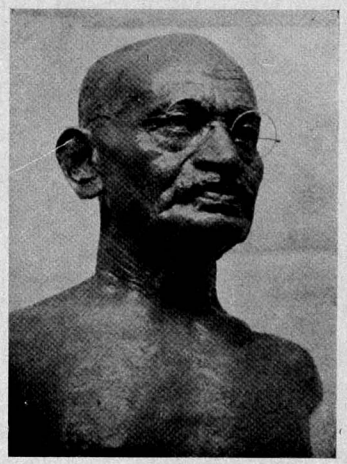

গান্ধীজী : ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী।

যোগিতায় হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে সম্মানিত হন ও উক্ত মূর্তিটি নির্মাণ করেন।

উনিশশো পাঁচশ সালে জয়পুর মহারাজার স্কুল অব আর্টস্ অ্যান্ড ক্রাফটস্-এর অধ্যক্ষ পদে দেখি হিরণ্ময়কে। পাঁচ বছর সেখানে থাকবার পর চলে এলেন লক্ষ্ণৌ। সেখানকার গভর্নমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্ অ্যান্ড ক্রাফটস্-এর উপাধ্যক্ষ পদ-গ্রহণ ও শিল্প-বিদ্যালয়টির নানারূপ উন্নতি সাধনে ব্রতী হোলেন তিনি। লক্ষ্ণৌ শিল্পবিদ্যালয়ে ভাস্কর্য-কলার (স্কাল্পচার ফ্রম লাইফ অ্যান্ড কম্পোজিসন্স) প্রথম ক্লাস আরম্ভ হয় তাঁরই প্রচেষ্টায়। ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হোল নবীন উৎসাহ। (এর আগে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত মাটির পুতুল গড়বার ক্লাস ছিল এবং ফাইন আর্ট ইত্যাদি ক্লাসের ছেলেদের এলিমেণ্ট্রি মডলিং শেখানো হোত।)

উত্তর প্রদেশের গোণ্ড শহর। পথ চলতে চলতে পথিকরা প্রণাম জানিয়ে যায় মূর্তিটির প্রতি। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি। সাড়ে নফুট উচ্চতা মূর্তিটির। ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর সাম্প্রতিক শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলে। দেওঘরে সুরক্ষিত বালানন্দ ব্রহ্মচারীর মূর্তিও একটি অপরূপ রূপকর্ম।

লক্ষ্ণৌ স্কুল অব্ আর্টস্ অ্যান্ড ক্রাফটস্-এর উপাধ্যক্ষ পদে বৃত হওয়ার পর থেকে লক্ষ্ণৌতেই স্থায়ী হোয়েছিলেন হিরণ্ময়।

অবশেষে শিল্পবিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত ও জীবনের প্রান্তে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও রূপান্বেষণে তন্ময় শিল্পীর জরা, মৃত্যুর বহু উর্ধেই ছিল অবস্থান।

হিরণ্ময়ের দুই পুত্র পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ কোরেছেন, এক পুত্র ইতিহাসের অধ্যাপক।

হিরণ্ময়ের জীবনে একটি ক্ষোভ যা তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি তা হোচ্ছে লণ্ডনে বহু কষ্ট স্বীকার কোরে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় ব্রোঞ্জ কাস্টিং শিখে আসা সত্ত্বেও একাজটি এদেশে শেখাবার সুযোগ লাভে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। সম্ভবত এর কারণ ব্রোঞ্জ কাস্টিং-এর জন্য ব্রোঞ্জ ফাউণ্ড্রি খুলতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা ছিল তাঁর সামর্থ্যের বাইরে।

উনিশশো বাষট্টি সালের আটাশে জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌস্থ বাসভবনে হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

"আমাদের দেশের সাধকের বাণী 'ধীরে ধীরে পগ-ধরো মুসাফির, সিঁড়ি হৈ অধবনী'—ধীরে ধীরে পা ধরো যাত্রীগণ, দুর্গম সোপান। অনলস সাধনা শিল্পীর সাধনা 'অনলসস্য কুতোসিদ্ধিঃ অসিদ্ধস্য কুতোধনং?"

আবক্ষ মূর্তি : স্রষ্টা হিরণ্ময় রায়চৌধুরী।

বালক মূর্তি : রূপকার হিরণ্ময় রায়চৌধুরী।

—এই অনলস শিল্পসাধনার ইতিহাসই হোচ্ছে ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর জীবনের ইতিহাস।

'Art is not a pleasure trip, it is a battle' মনীষী মিলের এই অমরবাণী অন্তরপটে ক্ষোদিত কোরে বর্তমানকালের তরুণ শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-সাধনার পথে যেন অগ্রসর হন—এইটুকুই ছিল পর-লোকগত ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর একান্ত অভিলাষ।

আমার কামনা আরো তা' দীর্ঘায়ু হোক—
পাষাণের মিঠে হাসি, প্ররোচক চোখ।
ও-হাসি, ও-চোখ কার সবুজ মনের,
ওতো যাদুঘর নিজেই—আকর্ষণের!
ইতিহাসে ওই হাসি, ও-চোখের দ্বিধা,
হারানো দিনের প্রামাণিক মুসাবিদা।
আমি জানি ওতো কার স্বরলিপি ঘিরে
কৈশিক সূক্ষ্মতা—আজো সমাহিত মীড়ে।

ও-হাসির অকূলেতে ও-চোখের গতি,
ভাস্কর—তোমার সম্পদের কোন নথি,
আজো তারা গেয়ে চলে নীরব কূজন।

তাই নিয়ে ব্যতিহারী দু'চোখ ও-মন
স্বপ্নের আশ্বিনে—এই নিথর বেলায়
গড়েছে প্রবাল-পুরী রূপের মেলায়।

শৈলশেখর মিত্র

ভাস্কর কারমারকর-এর আলোকচিত্র।

ভাস্কর কারমারকর

বিশেষ প্রতিনিধি

বাঙলাদেশের বিশেষ কয়েকজন ভাস্কর ছাড়া ভারতীয় অন্য ভাস্করদের সম্পর্কে আমাদের প্রায় কিছুই জানা নেই। প্রসঙ্গত মহারাষ্ট্রের খ্যাতিমান ভাস্কর মাহুত্রে, ওয়াঘ, তালিম, ফাড্‌কে প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে এঁদের অবদান সম্পর্কে বিস্মৃত হওয়া আমাদের সংকীর্ণ সংস্কৃতিচেতনার পরিচায়ক। আজ এঁদেরই মত বিস্মৃতপ্রায় একজন গুণী ভাস্করের পরিচিতি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা গেল।

কেবলমাত্র বাঙালী ভাস্করদের সম্পর্কে সুন্দরম্‌-এর এই সংখ্যা উদ্দিষ্ট হোলেও মহারাষ্ট্রের ভাস্কর ভি, পি, কারমারকর বাঙলাদেশের শিল্পী-সমাজের তথা গুণী-জনের সান্নিধ্যে ছিলেন বহুদিন। বাঙলাদেশে বাস কোরে বাঙলার সংস্কৃতিবান-সমাজের একজন হোয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কারমারকর ছাড়া বাঙলার বহিঃস্থ অন্যান্য কয়েকজন ভাস্করেরও কাজের নিদর্শন এ-সংখ্যায় দেখা যাবে।

বোম্বাই থেকে দশ মাইল। কল্‌বা জেলার শাস্‌ওনে গ্রাম। জেলা কালেকটর হোয়ে এসেছেন ওটো রথ-ফিল্‌ড্‌ আই. সি. এস। শাস্‌ওনে পরিদর্শন করার সময়ে গ্রামের মন্দিরগাত্রে শিবাজীর এক মূর্তি দেখে চমৎকৃত হোলেন। মহারাষ্ট্রে তখন শিবাজীর মূর্তি আঁকা আইন বিরুদ্ধ। কালেকটর সাহেব তাঁর তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন শিবাজীর মূর্তি-অংকনকারীকে। অনেকেই ভয় পেয়ে গেল। না জানি কি শাস্তি হয় শিল্পীর। কিন্তু সকলেই আশ্চর্য হোল এই শুনে যে সাহেব বালকশিল্পীকে শিল্পবিদ্যালয়ে পড়ার জন্য পনেরো টাকার বৃত্তি দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং একটা ফটো দিয়ে তা থেকে মাটির মূর্তি আঁকার জন্যে দশ টাকা দিয়েছেন। মাটির মূর্তি গড়ে তখন পাওয়া যেতো ছ'আনা থেকে দশ আনা। উনিশশো দশ সালের কথা বলছি।

উপরিউক্ত ঘটনাটির বালক শিল্পী হোলেন কারমারকর। আঠারশো বিরানব্বুই সালে তাঁর জন্ম।

শংখধ্বনি : কারমারকর-এর ভাস্কর্য নৈপুণ্যের বিশিষ্ট তাৎপর্যে মূর্তিটি প্রাণবন্ত।

ডানদিকের পাতায় :
ভাস্কর কারমারকর-কৃত
একটি নগ্ন-মূর্তির দেহের
ছন্দময় সৌন্দর্যের প্রকাশ।

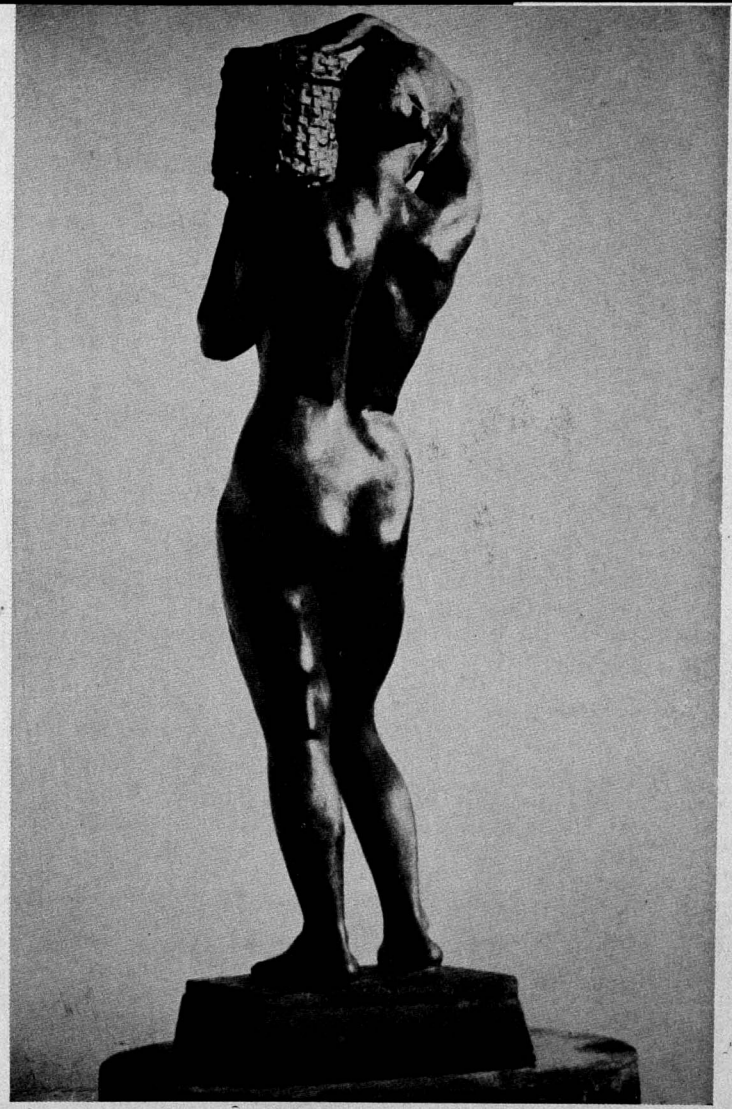

গণেশের মূর্তি গড়াই তাঁদের বংশগত পেশা। কারমারকরের বাবাও ছিলেন মূর্তি-শিল্পী। কারমারকর আর্ট স্কুলে যোগ দিয়ে মোট বৃত্তি পেলেন পঁয়ত্রিশ টাকা। উনিশশো তের সালে বোম্বে আর্ট স্কুল ত্যাগ করেন তিনি। লাভ করলেন 'মেও পদক'।

উনিশশো চব্বিশ সাল। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাইতে এসেছেন। কারমারকরকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর কলকাতার বাসভবনে থাকার জন্যে। কলকাতায় থাকার সময় কারমারকর অনেক অর্ডার পেলেন। যাঁদের কাছ থেকে অর্ডার পেয়েছিলেন তাঁরা হোলেন—শোভাবাজারের মহারাজা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য-পরিষদ), বিচারপতি স্যার এ. চৌধুরী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আর, এন, মুখার্জি প্রভৃতি।

কলকাতায় কিছুদিন থাকার পর তিনি বিলেত যান। রথফিল্ড সাহেব, ডাক্তার ভাজেকার, ডাক্তার রাও, ওয়াদিয়া প্রভৃতি মনীষীদের সহায়তায় তিনি দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন বিলেত যাবার পাথেয় হিসেবে। বিলেত থাকার সময়ে রয়্যাল য়্যাকাডেমিতে তিনি ভাস্কর্য শিক্ষা করেন। ব্রোঞ্জ কাস্টিং ছিল তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়। শিক্ষাশেষে তিনি ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের আর্ট গ্যালারীসমূহ পরিদর্শন করেন।

ভারতে ফিরে এসে তিনি কলকাতাতেই স্টুডিও খোলেন। কলকাতায় থাকার কয়েক বৎসর বেশ কষ্টেই কাটে। আর্থিক অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছোয় যে তাঁকে শংখের মূর্তিও গড়তে হয়। (মারাঠীদের মধ্যে একটা বিশ্বাস যে শংখে ফুঁ দিলে মানুষের সুদিন ফিরে আসে) 'শংখধ্বনি' সত্যিই তাঁর কপাল ফিরিয়ে দেয়। সেই বৎসরেই ফাইন্ আর্টস সোসাইটির প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেলেন। কোল্হাপুরের মহারাজার আমন্ত্রণে চলে গেলেন তাঁর বাংলোতে। এই সময় কারমারকর অনেকগুলি শিবাজীর মূর্তি গড়েন।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এয়ার কম্প্রেসার মেসিনের ব্যবহার কারমারকরই প্রথম করেন। ভারতের বাইরে থেকে

বাঁদিকের পাতায় :
জেলেনী : ভাস্কর্যটির
রূপকার বিনায়ক
পাণ্ডুরাং কারমারকর।
ইনি মহারাষ্ট্রের অধিবাসী
হোলেও বাংলাদেশে
কর্মরত ছিলেন অনেকদিন।

এ-যুগে মূর্তি গড়ার অর্ডার কারমারকরই বোধহয় প্রথম লাভ করেন। সে মূর্তি মিল্টন কলেজের সভাপতি ডব্লিউ সি. ডালাণ্ডের। এই মূর্তিটি বিদেশীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। শিবাজীর মূর্তি গড়ার জন্যে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক প্রতিযোগিতা হয়। কারমারকর ব্রোঞ্জের ওয়ান্ পিস কাস্টিং-এ চোদ্দ ফিট শিবাজী মূর্তি গড়েন এবং প্রথম হন। এ কাজ তাঁর আগে ভারতে কেউ করেনি। ভারতীয় ভাস্করদের মধ্যে অনেক দিক দিয়েই তাঁর নিজস্বের এবং নতুত্বের পরিচয় পাই।

কারমারকরের জীবনীপ্রসঙ্গে পরিশেষে এই কথা বলা যেতে পারে যে, আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা শিল্পীর স্বাধীন শিল্প-চেতনার রূপায়ণ দেখতে পাই এর মূলে কারমারকর প্রমুখ পূর্বসূরীদের কতখানি অবদান তার আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

'ভারতবর্ষ—১৯শ বর্ষ—১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত মনীন্দ্রভূষণ গুপ্তের প্রবন্ধ অবলম্বনে।

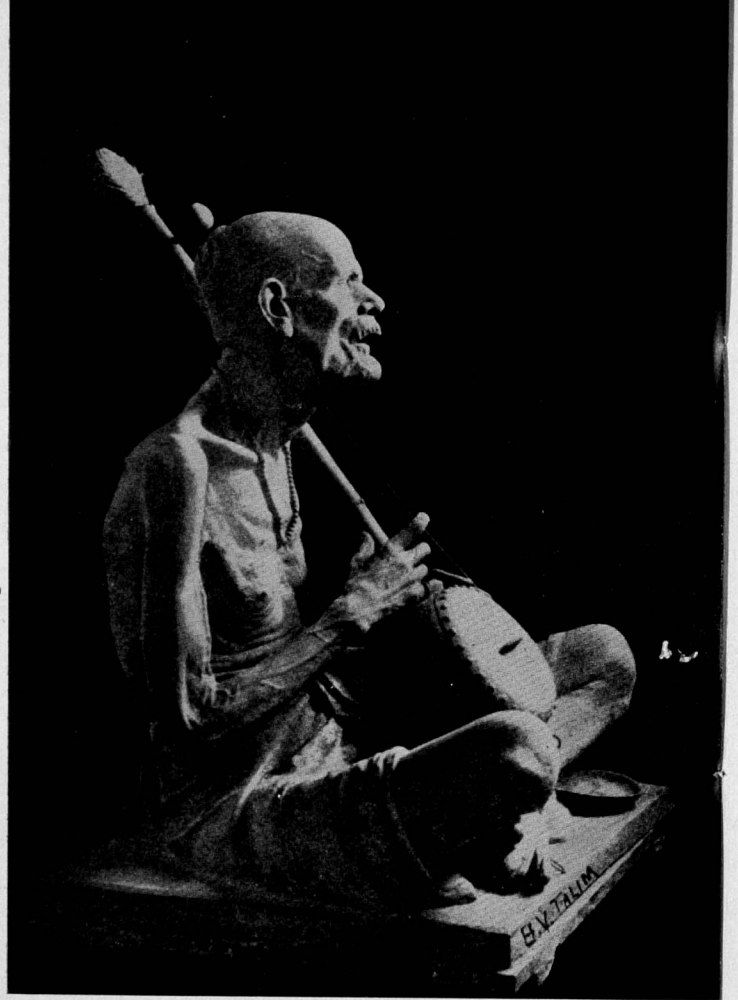

বাঁদিকের পাতায় মহারাষ্ট্রের ভাস্কর তালিম-কৃত
একটি অনবদ্য ভাস্কর্যের
প্রতিলিপি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।
জনৈক ভক্ত ভগবানের
বন্দনাগানে-রত।

ভাস্কর পরিচিতি : প্রমথ মল্লিক

এই প্রবন্ধটি লিখেছেন : রাণা বসু

বাড়ির দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়লুম।

বেরিয়ে এলেন পরিণত বয়সের এক ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন : কাকে চান।

আমি বললুম : প্রমথ মল্লিক মশায়ের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে এসেছিলুম। তিনি কি বাড়িতে আছেন?

ভদ্রলোক বললেন : আমি-ই প্রমথ মল্লিক। আপনার কী জিজ্ঞাসা আছে বলুন।

আমি বললুম : শিল্পী সুভো ঠাকুর সুন্দরম্ নামে শিল্পকলার একটি পত্রিকা বের করেন। এবার সুন্দরম্-এর একটা বিশেষ সংখ্যা বের হচ্ছে—ভারতীয় ভাস্কর্য ও ভাস্করদের ওপর। আপনি একজন ভাস্কর, ঠাকুর মহাশয় আপনার পরিচিতি সুন্দরম্-এ প্রকাশ করতে চান। আমাকে তিনি সে-কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছেন।

আমার কথাগুলো শেষ হবার পর খানিকটা সময় স্তব্ধতার ভেতর কাটলো।

স্বনামধন্য ভাস্কর প্রমথ মল্লিক রূপায়িত ভাস্কর্য। নাম : শৃঙ্খলিত বৎসরগুলি।

তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মল্লিক মশায় বললেন : বর্তমানে আমি বাঙালীর মন থেকে হারিয়ে যাওয়া একজন জীবিত ভাস্কর। কুড়ি বছর হল আমার একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর পর আমি শিল্প রাজ্য থেকে চিরকালের মতন বিদায় নিয়েছি। মেয়েই ছিল আমার ভাস্কর জীবনের অন্যতম প্রেরণা স্বরূপ। তাকে হারানোর পর আমি আর কোনো কাজ করিনি। মেয়ে একটি কন্যা সন্তান রেখে গত হয়। বর্তমানে নাতনীটিকেই আমি ও আমার স্ত্রী লালন করছি। একদা আমার সৃষ্ট ভাস্কর্যের মধ্যে যে জীবন্ত রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলুম এখন রক্ত মাংসের দেহধারী কল্যাণীয়া নাতনীটির মধ্যে সে-রূপকে সার্থক করার ইচ্ছে নিয়েই দিনগুলো কাটাচ্ছি।

সুভো আমার বিশেষ স্নেহভাজন। সে যখন আপনাকে পাঠিয়েছে তখন আপনাকে ফেরাবো না। তবে একটা কথা আছে। জীবনের সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর স্মৃতি আজ এতো ঝাপসা যে অনেক কথাই আপনাকে আজ গুছিয়ে বলতে পারব না। তবু স্মৃতি মন্থন করে চেষ্টা করব কিছু বলার।

নাম প্রমথ মল্লিক। বয়েস এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। কথা হচ্ছিল মল্লিক মশায়েরই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির স্টুডিও-তে বসে। ঘরটার চারদিকে ভাস্করের নিজের তৈরি কয়েকটি ভাস্কর্যের নমুনা এদিক-ওদিক করে সাজানো রয়েছে। দেয়ালে টাঙানো আছে বিভিন্ন প্রদর্শনী থেকে পাওয়া প্রশংসিকা। গুরু ভি, পি, কারমারকর-এর একখানা ফটো। সদা হাস্যময়, নিরহঙ্কার মল্লিক মশায় আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন। বললেন : আমি যখন ভাস্করের জীবন গ্রহণ করি তখন বাঙলা দেশে দু-চারজন ভাস্কর ছিলেন। প্রখ্যাত বাঙালী ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী মশায় তখন সবেমাত্র বিলেত থেকে ভাস্কর্যের পাঠ শেষ করে দেশে ফিরেছেন। তাঁর যশস্বী ছাত্র বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভাস্কর ও কথাশিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তখন কিছু কিছু ভাস্কর্য-কর্ম করছেন। আমি ও আমার-ই মতন কয়েকজন শিল্পপিয়াসী তরুণ বাঙালী তখন শুরু করেছিলুম ভাস্কর্যের পাঠ। সে এক যুগ গিয়েছে। ভাবলে আমি অবাক হই।

ছোটবেলা থেকেই মল্লিক মশায়ের শিল্পকলার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ছিল। অন্যের সাহায্য ছাড়াই তিনি ঘরে বসে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' মূর্তি গড়তেন, রঙ তুলি দিয়ে ছবি আঁকতেন। আজকালকার মতন সে-দিনের কলকাতা শহরের বুকে শিল্প-পাঠ গ্রহণের জন্যে তেমন শিল্প-শিক্ষালয় ছিল না বললেই চলে। শিয়ালদহের কাছাকাছি জুবলী আর্ট আকাডেমী নামে একটি শিল্প-শিক্ষালয় ছিল। রণদাপ্রসাদ গুপ্ত নামে এক শিল্পী-শিক্ষক সে-বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিল্প-বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। জুবলী আর্ট আকাডেমীতেই প্রমথ মল্লিক তাঁর শিল্প-বিদ্যার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন আনুমানিক উনিশশো বার থেকে তের খ্রীষ্টাব্দে। এই

শিল্প-শিক্ষা নিকেতনে আজকের প্রবীণ ভাস্কর শ্রীমল্লিক প্রায় চার বছর ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। বর্তমান কালের বহু যশস্বী শিল্পী হেমেন মজুমদার, অতুল বসু, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ কর্মকার প্রমুখ একদা এই শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। জুবলী আর্ট আকাডেমীতে মূলত তেল রঙ, জল রঙ, রেখা-চিত্র ইত্যাদি অঙ্কন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হত।

জুবলী আর্ট আকাডেমীতে মডেলিং বিষয়ে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না তা নয়। কিন্তু মডেলিং বিভাগে দু-একজনের বেশি ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতেন না বলে ওই বিষয়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তেমন নজর ছিল না। কিশোর প্রমথ মল্লিকের মডেলিং-এর প্রতি প্রবল ঝোঁক লক্ষ্য করে তাঁকে মডেলিং বিষয়ক শিক্ষায় গুপ্ত মশায় প্রভূত সাহায্য করেন। শ্রীমল্লিক লাইফ মডেলিং-এর পাঠ রণদাপ্রসাদ গুপ্তের কাছেই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যালয়ে নিয়মিত মডেলিং চর্চার অসুবিধা লক্ষ্য করে প্রমথ মল্লিক আপন গৃহে গভীরভাবে মডেলিং-এর অনুশীলন শুরু করে দেন। এইভাবে হঠাৎ-ই একদিন শিল্প বিদ্যালয়ে তাঁর নিয়মিত গমন বন্ধ হয়।

কলকাতায় তখন ওরিয়েণ্টাল আর্ট একজিবিশন নামে এক শিল্প প্রদর্শনী হত। প্রমথ মল্লিকের চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়েসের সময় উক্ত শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর হাতের কাজের দুটো নমুনা প্রথম প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে তাঁর ভাস্কর্যের সে-দুটো নিদর্শন শিল্পরসিকদের কাছে বহু প্রশংসিত হয়। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় প্রমথ মল্লিকের সে-দুটো ভাস্কর্য কর্ম দেখে এতো খুশী হন যে তিনি আপনা থেকে শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রমথ মল্লিকের ভাস্কর জীবনের সৌভাগ্যের সূচনা ওরিয়েণ্টাল আর্ট একজিবিশন থেকেই। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রথম আলাপেই প্রমথকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন। শিল্পাচার্য দেখেছিলেন তরুণ ভাস্করটির মধ্যে পরিণতির সুবিপুল সম্ভাবনা। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রমথ-র শিক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে উপযুক্ত ভাস্কর-শিক্ষক পাচ্ছে না শুনে—তিনি নিজে তাঁকে সঙ্গে করে তৎকালীন ঝাউতলা রোড নিবাসী ভি, পি, কারমারকর-এর কাছে নিয়ে যান ও কারমারকর-এর সঙ্গে প্রমথ-র পরিচয় ঘটিয়ে দেন।

ভি, পি, কারমারকর-এর কাছেই মুখ্যত প্রমথ মল্লিক ভাস্কর্যের পাঠ গ্রহণ করেন। ছাত্র হিসেবে শ্রীমল্লিক তিন বছর কারমারকর-এর কাছে শিক্ষানবিসী করেন। আকস্মিকভাবে একদা কারমারকর বিলেত গমন করলে শ্রীমল্লিকের গুরু-গৃহে যাতায়াত বন্ধ হয়। বিলেতে কারমারকর দু-বছর কাটিয়ে আবার দেশে ফিরে আসেন। শ্রীকারমারকর দেশে ফিরলে প্রমথবাবু পুনরায় তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করেন।

তিরিশ বছর বয়েসের মধ্যে ভাস্কর প্রমথ মল্লিকের নাম ও যশ কলারসিক মহলে বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে শ্রীমল্লিক-কৃত ভাস্কর্য নমুনাগুলো পুরস্কার পায় ও শিল্পীর ভাস্কর নামের গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ভাস্কর্যের জন্যে তিনি যে-সব প্রদর্শনী থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন তাদের কয়েকটার মাত্র নাম এখানে উল্লেখ করলুম।

প্রমথ মল্লিকের যৌবন কালে গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস-এর উদ্যোগে প্রতি বছর সোসাইটি অব ফাইন আর্টস নামে এক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। এ প্রদর্শনীতে ভি, পি, কারমারকর, দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী প্রমুখ ভাস্করদের ভাস্কর্য সৃষ্টিগুলো স্থান পেতো। এই প্রদর্শনীতে শ্রীমল্লিক স্ব-রচিত ভাস্কর্য প্রেরণ করে কয়েকবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন।

মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর আর্ট সোসাইটি আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনীতে প্রমথ মল্লিক কয়েকবার ভাস্কর্য কর্ম প্রেরণ করে প্রথম পুরস্কার বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ব্যাঙ্গালোর-এ শিল্প প্রদর্শনী থেকেও তিনি ভাস্কর্যের জন্যে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্ধ্র, সিমলা, পাতিয়ালা ও মহীশূরে দশেরা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য পাঠিয়ে স্বর্ণপদক পান। আকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর বার্ষিক প্রদর্শনীতেও তাঁর ভাস্কর্য কর্মগুলো রূপরসিকদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয় এবং সে-প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে তিনবার প্রথম পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

পার্সি ব্রাউন যখন কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর কিউরেটর ছিলেন তখন তিনি প্রমথ মল্লিককে মেমোরিয়াল-এর কিছু কিছু কাজের ভার দেন। ভাস্কর মল্লিক ব্রাউনকে তাঁর হাতের কাজের দ্বারা খুশী করতে সমর্থ হন।

ওরিয়েণ্টাল আর্ট একজিবিশনে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রমথ মল্লিকের যে পরিচয় ঘটেছিল অবনীন্দ্রনাথের তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত সে-পরিচয় ও বন্ধন প্রীতি ও শ্রদ্ধার মধ্যে অটুট ছিল। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, প্রমুখ ঠাকুর পরিবারের কৃতী ও যশস্বী সন্তানদের কাছে প্রমথ মল্লিক যে কতোভাবে ঋণী তা আজও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রমথ মল্লিককে ভাস্কর্য সৃষ্টিকর্মে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না দিলে বাঙলা দেশ কোনোদিনই হয়তো প্রমথ মল্লিকের মতো একজন গুণী ভাস্করকে পেতো না। ভাস্কর প্রমথ মল্লিক আজও আমাদের মধ্যে জীবিত এজন্যে আনন্দ অনুভব করি।

বাংলার কৃষক : প্রমথ মল্লিক-কৃত ভাস্কর্য।

বিখ্যাত ভাস্কর জি, কে, মাহাত্রে খোদিত 'মন্দিরে'। এটি তাঁর অল্প বয়সের কাজ হোলেও এত সজীব, নির্মল ও ভাবব্যঞ্জক মূর্তি এদেশে কেন বিদেশেও কম আছে।

আজ গোটা কতক কথা মনে এল শিল্পের 'ক' 'খ' জানতে এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই :—

(ক) যে ছবিকে লোকে পাথরে কাটলে কাঠে কুন্দলে সূঁচ দিয়ে তুল্লে কিম্বা আঁচড়ে বার করে আনলে তারা এক জিনিষ আর—

(খ) যে ছবি ফুটলো পটে সে আর এক জিনিষ।

কারণ (ক) সে মানুষের শক্তির পরিচয় ছাড়িয়ে উঠতে সম্পূর্ণভাবে পারলে না। মানুষ-ছোঁয়া হয়ে রইল অনেকখানিই, যে তাদের ফোটালে তার বাহাদুরি কতকটা মনে পড়াতে থাকলো—যেভাবে কাগজের ফুল সেইভাবের কাজ এরা।

(খ) কিন্তু অন্যভাবে কাজ করতে থাকলো, কেননা সে সত্যি ফুটলো পটে, কেউ যে তাকে ফুটিয়েছে যত্নে চেষ্টায় এটা লোপ পেয়ে গেল কাজ থেকে।

একমাত্র চিত্রে সুকুমার সমস্ত পরশ দিয়ে এইভাবে রস ফোটানো চললো—অন্য কিছুতে নয়।

কাযটি ফুটলো চমৎকার, কায যে ফোটালে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল পরিষ্কার—এ হল চিত্রবিদ্যার চরম সার্থকতা—সবাই এটা পারে না।

নদীজলে মাছ থাকে কিন্তু আঁস-গন্ধ পায় না জল। কুণ্ডের জলে মাছ থাকে জল পর্যন্ত মাছের গন্ধে দূষিত হয়!

(ক) তেমনি একরকম ফুলও আছে যা মালি মালি গন্ধ করে, কাযও আছে. যা মানুষ মানুষ গন্ধ করে!

(খ) আর একরকম কাজ আছে যা ফুটন্ত ফুল—ফুল ফুল গন্ধ করে।

Tradition-এ আর Fashion-এ গোল করেছেন বিরু। বোঁটা ছাড়া ফল যেমন অসম্ভব, tradition ছাড়া Art-ও তেমনি অসম্ভব। মৌচাক tradition-মতো গড়া হয়—মধুও তৈরী হয় traditional প্রথায়; নতুন নতুন বাগানের ফুলে নতুন নতুন মৌমাছি মধুও রচনা করে, এইতো জানি। চাক্ ছাড়া মধুর মানে কেমিক্যাল মধু যা জার্মানি ও বিলাত থেকে আসে; তার স্বাদ আর আসল মধুর স্বাদ ঢের তফাৎ। Saccharine রোগীর পক্ষে, Glucose তাও মুমূর্ষুর পক্ষে, সুস্থ মানুষের পক্ষে আক্ না হয় মধু। তাড়ি খায় মাতালে তাও প্রস্তুতের tradition আছে। গুড় প্রস্তুতের tradition ছেড়ে গুড় কে করে? আমাদের প্রত্যেকের অস্থি-মাংস-মজ্জা সবই tradition মতো ধরে. তবেই হয়েছি তুমি, আমি, এ, ও, সে; ওটা বাদ দিয়ে Spirit নিয়ে ভূতগত ব্যাপার সৃষ্টি হতে পারে। পূব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশই নেই, কোন art নেই যার tradition নেই, খালি আমাদেরই থাকবে না—এ কেমন কথা? জগৎজোড়া ফুলবাগিচা, ছেড়ে দাও সেখানে ছাত্রদের, বেছে নিক নিজের অমৃত নিজেরাই। নয়তো tradition বাদ ছবি, মূর্তি, তাদের করে দেখাও পারো তো—Example is better than precept। বরং অজন্তা জান, কিন্তু Argentine কিছুতেই নয়।

—অবনীন্দ্রনাথ

হে শালভঞ্জিকা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।

আজো শালবনে মঞ্জরী আসে
জরতী পৃথিবী আজো—
ভোলে নি কো তার ফুল-ফোটানোর
ফল ফলানোর কাজ
কুমারী ভোলেনি শিহর-শিথিল
প্রথম প্রণয়-লাজও।
কতো শতাব্দী পরেও যুবতী
জানলায় করে সাজ।

দেখিনি সে যুগ...লুপ্ত গন্ধ
তবুও জড়ায় ঘ্রাণে—
কালের কবর খুলে যেন পাই
পাষাণ ছবির মানে!
ধূসর অতীতে সন্ধানী মন ছড়ালো যে আলোকন
একে যেন পারি ক'রে রেখে দিতে সারাজীবনের ধন।
নাচের ছন্দে দোলায়িত কটি
পুষ্ট জঘন, স্তন—
হ্রস্ব-কোঁচার জানু-ছোঁয়া-ধটী
আধো-আধো বিবসন—
বঙ্কিত চোখে অঙ্কিত ভুরু
সঙ্কেত গূঢ় তার;
কদলীকাণ্ড সদৃশ দু'উরু
আলস্যে গুরুভার
নিয়েই বুঝি বা হয়েছো পাষাণী, হে শালভঞ্জিকা!
চিরজয়ী যৌবনকে পরিয়ে স্পর্শ-ললাটিকা!
রক্তে, মাংসে ধরো নি তো দেহ যৌবনও তাই স্থির—
চির-লীলা-সহচরী শাশ্বত অভিসার-রজনীর।
নইলে জানো তো কালের দস্যু কাকেও করে না ক্ষমা
পাষাণী হয়েই বেঁচে গেছো অনুপমা।

বিহারে অথবা মন্দির গায়ে অথবা কুলুঙ্গীর
কোন অলিন্দে, ভিত্তি-ফলকে কোন গৃহ-বলভীর
কোথায় স্তম্ভশীর্ষে অথবা কুম্ভ্যাশ্রয়ে স্থান
পেয়েছিলে তুমি প্রস্তরময়ী, হে শালভঞ্জিকা!
কতো কামিনীর মনের গোপন কতো কামনার শিখা
আহরণ ক'রে গড়েছে শিল্পী অমর কীর্তি—গান
আখরে আখরে; পাথরে পাথরে লোকবিশ্রুত দান—
সে কোন শিল্পী আমরা ভুলেছি নাম তার
অজ্ঞতা দিয়ে জাঁকিয়ে রেখেছি ইতিহাসে কুয়াশার ভার
প্রণাম তোমায় মহান্ শিল্পী, আদি শিল্পের গুরু।
সে-নামহীনেরই আদর্শে বুঝি হলো শিল্পের শুরু!

[এই কবিতার নায়িকা খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি বিবসনা শালভঞ্জিকা-মূর্তি। ভারতের বিভিন্ন স্থানের দেব-দেউলে কিংবা বৌদ্ধবিহারে প্রাচীরকন্যা হিসাবে শালভঞ্জিকা অঙ্কিত বা খোদিত পাওয়া যায়। শালবনে মুঞ্জরণ-কাল এলেই কি ভাবে যে সেকালে যৌবনমত্তা যুবতীরা শালবনবিহার করতে বেরোতেন এবং শালবন মধ্যে তাঁদের নৃত্যোৎসব প্রভৃতির রোমাঞ্চ আমরা হয়তো আজকের দিনে ঠিক অনুভব করতে পারিনা তবে কিছুটা কল্পনা ক'রে নিতে পারি। শালমঞ্জরী আহরণ-রতা কোনো যৌবনমদান্বিতা নারীমূর্তি—এই অর্থেই শালভঞ্জিকার আদি প্রয়োগ দেখা যায়। তবে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে এই আদি অর্থ পরিবর্তিত হয়ে (১) কাষ্ঠপুত্তলী এবং এমন কি (২) বেশ্যা—এই অর্থেও পরিণতিলাভ করেছিলো। সেজন্য উক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে অপরগুলিও বিবৃত আছে দেখা যায়। শব্দটির আদ্যর্থে শেষোক্ত দু'টি অর্থ অভাবিত ছিলো মনে হয়। সে যাই হোক, কলকাতার মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের গ্যালারিতেও অন্তত তিন চারটি শালভঞ্জিকা-মূর্তি আছে। কোনারক থেকে আনা একটি কালো পাথরের শালভঞ্জিকা-মূর্তি একতলার বারান্দাতেও দেখা যায়। অপর একটি ভঞ্জিকা-মূর্তি সাম্প্রতিক সংগীতিবর্ষের বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উক্তস্থানে যে প্রদর্শনী খোলা হয়েছিলো তাতে ছিলো। সেটি খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকের, প্রাপ্তিস্থান সাঁচী। এই বিবসনা নারীমূর্তিটি অত্যন্ত আদিরসাত্মক হওয়া সত্ত্বেও শিল্পলালিত্যে ও গঠনসৌষ্ঠবে যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শনের পাশে স্থান পাবার যোগ্য। পশ্চিমভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়ামেও বিভিন্ন শালভঞ্জিকা-মূর্তি দেখেছি। সে যুগে শিল্পী ও কবিদের নিজ নিজ শিল্প বা কাব্যের রূপায়ণে শালভঞ্জিকা [অর্থাৎ শালমঞ্জরীচয়নরতা নারী মূর্তি] একটি সহজলভ্য উপলক্ষ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হতো। মন্দিরে, গুহাচৈত্যে, বিহারভবনের গাত্রে বুদ্ধের জীবনী বা জাতকের গল্প ছাড়াও যেমন নানা দেবতা, যক্ষ-যক্ষী, কিন্নর-কিন্নরী, নাগ-নাগিনী, নাগিনী কন্যা, ধ্বজাবাহিকা, দেহরক্ষী, সখী, মাল্যবাহিকা, করঙ্কবাহিনী, বিচিত্র-কামবন্ধযুক্ত মিথুন নানা বাস্তব অবাস্তব জীবজন্তু, দর্পণহস্তা ও প্রসাধনরতা নারী, সন্তানবৎসলা জননী, শুকবিলাসিনী নারী, পানোন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষ, কামদেব ও রতি ইত্যাদি যেমন ব্যবহৃত হতো শালভঞ্জিকা-মূর্তিও সেইভাবেই অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো।—বি. ব.]

খবরাখবর

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর পরলোক গমন।

শিল্পী বা কবির মৃত্যু সংবাদ! সংবাদপত্রের এক কোণে ঠাঁই মেলে যার। কারো-বা চোখে পড়ে। কারো-বা পড়ে না। তাতে কিছু যায়-আসে না অনেকের। তথাকথিত সেই 'অনেক', যাঁরা জগতে কবি বা শিল্পীর অস্তিত্বের অপরিহার্যতা সম্পর্কে অনবহিত।

ভারতবরেণ্য ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ চোখে পড়েছিল, সংবাদপত্রের শিরোনামায় নয়, যথারীতি এক কোণে, পৃথিবীর বহু দরকারী খবরের ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলির মধ্যিখানে।

সত্যি, আমরা ক'জন জানি বা জানতে চেয়েছি কে এই হিরণ্ময় রায়চৌধুরী? ভাস্কর হিসাবে কি অবদান তাঁর? প্রথম এ, আর, সি, এ তিনি ভারতীয়দের মধ্যে? লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত আর্টস্ স্কুলের উপাধ্যক্ষ তিনি—যাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে প্রচলিত হোয়েছিল ভাস্কর্য-কলা শিক্ষার ক্লাস?—এগুলি উল্লেখযোগ্য তো বটেই হিরণ্ময়ের সুদীর্ঘ জীবনে, সর্বোপরি তিনি ছিলেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর গুরু। ভরতের আধুনিক শিল্পেতিহাসের বরণীয় শিল্পী আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যধন্য। ভারতের শিল্পকলায় যে নবউজ্জীবনের সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেদিন, তার পিছনে প্রেরণাদায়িকা শক্তি হিসাবে কাজ কোরেছিল ভারতাত্মার চিরন্তন আহ্বান—সত্য ও সুন্দরের উপাসনা। সত্য ও সুন্দরের সাধনায় জীবন উৎসর্গ কোরতে এগিয়ে এসেছিলেন যে ক'জন শিল্পী-পূজারী তাঁদেরই একজন হোলেন হিরণ্ময় রায়চৌধুরী। তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে জানা গিয়েছে এই সংখ্যার নাতিবৃহৎ একটি নিবন্ধে।

বছরখানেক আগে, যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে তাঁর জীবনী ও কাজের নিদর্শনগুলির ফোটোগ্রাফ চেয়ে পাঠিয়ে চিঠি লিখি তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ ও শিল্প-রচনায় ক্লান্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনে মনে ছিলেন অসুখী। আমাদের পত্রের উত্তরে মনের ক্ষোভ জানিয়ে একজায়গায় লিখেছিলেন : 'আমার বিষয় আপনারা কি শুনতে চান, আমার জীবন অসম্পূর্ণ, আমার কাজ অসম্পূর্ণ সুতরাং আমার উপর আপনাদের যে ধারণা তাও অসম্পূর্ণই হবে। দেশ আমাকে জানবার বা কাজ কোরে দেখাবার কোনও সুযোগ দেয়নি, অবশ্য আমিও কোনোদিন নিজের ঢাক নিজে বাজিয়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করার চেষ্টা করিনি। দেশের ছেলেরা কেউ আমার কাছ থেকে শেখবার কোনো চেষ্টা করেনি এক দেবীপ্রসাদ ছাড়া।'

ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর স্বর্গত আত্মার কল্যাণ কামনা করে সুন্দরম্। তাঁর পরিবারবর্গের ন্যায় আমরাও বিচ্ছেদ বেদনাতুর। হিরণ্ময়ের জীবৎকালে সুন্দরম্-এর ভারতীয় ভাস্কর্যের এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হোলে তাঁর শুভ্র-হৃদয়ের ঐকান্তিক আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ থাকতো না।

ভাস্কর্য সম্পর্কে একটি পত্রিকা।

ভারতে শিল্প অর্থাৎ আর্ট সম্পর্কে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা আঙুলে গোনা যায়। শিল্পের কোনো একটি বিশেষ শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা দুর্লভ।

বোম্বাই-এর 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্পটার্স এসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'দি ইণ্ডিয়ান স্কাল্পটার' সেই দুর্লভ পত্র-পত্রিকার মধ্যে একটি। নামেই প্রকাশ, কেবল-মাত্র ভাস্কর্যই উক্ত পত্রিকার বিষয়বস্তু এবং ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই প্রবন্ধ সমূচয় লিখিত। ('ইণ্ডিয়ান স্কাল্পটার্স এসোসিয়েশন'-এর ঠিকানা : ১৬৪-বি ক্যাসা উরবিনা, ভিনসেণ্ট রোড, দাদার, বোম্বাই-১৪। কোলকাতাস্থ সোল এজেণ্ট : অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারি কোম্পানি, কোলকাতা-১৬। দাম অনুল্লিখিত। সম্পাদনা কোরেছেন : টি, এন, শ্রীবাস্তব)।

প্রবন্ধগুলি সুনির্বাচিত। ভূপেন্দ্র কারিয়া লিখিত 'বুদ্ধের মাথা', ধনরাজ ভগত লিখিত 'সৃজন ধর্মী ভাস্কর্য' ও অমরনাথ সেগল লিখিত 'ভবিষ্যতের ভাস্কর্য' লেখকদের গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। ধনরাজ ভগত নিজেই একজন ভাস্কর সে-কারণে তাঁর মতামতের গুরুত্ব আছে যথেষ্ট।

প্রবন্ধগুলি ছাড়া ভারতের পূর্বতন ও আধুনিক ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলির প্রতিলিপিগুলি সুমুদ্রিত হওয়া শিল্প রসিকজনের শুধু নয়, সাধারণ পাঠক-দেরও সুনিশ্চিত তৃপ্তি। আধুনিককালের বিশিষ্ট ভাস্করদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হোয়েছে।

ভাস্কর্য-কলা সম্পর্কে সাধারণ্যে ঔৎসুক্য নিতান্ত স্বল্প। এই পত্রিকাটি মারফৎ সেই ঔৎসুক্য প্রসারের সহায়তা ঘটবে বোলে আমাদের ধারণা।

এই ধরণের বিশেষ একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্পটার্স এসোসিয়েশন'-কে আন্তরিক সাধুবাদ জ্ঞাপন করি। পরবর্তী সংখ্যাটির জন্যও আমাদের ঔৎসুক্য রইল। আশা করি পরবর্তী সংখ্যাটিও এই সংখ্যাটির মতই বিষয় গৌরবে, সুমুদ্রণে ও সুসম্পাদনায় সার্থক হোয়ে উঠবে।

কোলকাতায় : ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

কিছুদিন আগে বিখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এসেছিলেন কোলকাতায়। বর্তমানে তিনি মাদ্রাজে বস-বাস কোরছেন। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি নির্মাণের ব্যাপারেই তাঁর আগমন। এদেশের ও বিদেশের বহু ভাস্কর রবীন্দ্রনাথের মূর্তি গড়েছেন—এই প্রতিভা প্রদীপ্ত পুরুষকে প্রতিভাত কোরতে চেয়েছেন তাঁরা নানা রূপে। দেবীপ্রসাদের সৃষ্টির মধ্যেও হয়তো নবতর কোন রূপ দেখা যাবে বিশ্বকবির।

অসিতকুমার হালদারের কোলকাতা-আগমন।

অসিতকুমার হালদারের পরিচয় মুখ্যত চিত্রশিল্পী হোলেও ক্ষুদ্রাকৃতি অর্থাৎ মিনিয়েচার ভাস্কর্যের রূপকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে। সুন্দরম্-এর এই সংখ্যাটি থেকে সে-পরিচয় সাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত হবে।

শিল্প-সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারেই নাকি তাঁর কোলকাতায় আসা। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হোলে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের শিষ্য অসিতকুমার হালদার মহাশয়-এর কাছ থেকে ভারত শিল্পকলার মর্মকথা আমাদের নিকট আরো স্বচ্ছ হোয়ে উঠবে। লেখনী-কুশল অসিতকুমারের নতুন কোরে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না।

সুভাষচন্দ্রের মূর্তি।

বাংলার বীর সুভাষ, ইতিহাসের সেই অসামান্য পুরুষ, যাঁকে লোকমানস রূপকথার রাজপুত্রের চেয়েও অলৌকিক জগতের অধিবাসীতে পরিণত কোরেছে—শোনা যাচ্ছে তাঁর একটি মর্মর মূর্তি নির্মাণের পরি-কল্পনা হোয়েছে এবং সে-মূর্তি নির্মাণের ভারপ্রাপ্ত হোয়েছেন অগ্রগণ্য ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভাস্কর্য-কলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা বিষয়ে ইতিপূর্বে সুন্দরম্-এ আলোচিত হোয়েছে। আশা করি তাঁর শিল্প প্রতিভার বিশেষ নৈপুণ্যে সুভাষচন্দ্রের মূর্তিটি রূপায়িত হোয়ে উঠবে।

'চাঞ্চল্যকর না লজ্জাকর?'

বিগত চব্বিশে অগাষ্ট তারিখে দৈনিক আনন্দবাজারের বিশেষ প্রতিনিধি উপরোক্ত শিরোনামে চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্যের সাম্প্রতিককালের অপহরণ প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান ও সময়োচিত আলোচনা কোরে দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন আমাদের।

তিনি লিখেছেন : 'আজ ময়দানের ব্রোঞ্জ মূর্তির হাতে রাইফেল নেই, কাল সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরখানা থেকে ডিরোজিও-র স্মৃতি-ফলক নেই; আশুতোষ মিউজিয়াম থেকে দুর্গামূর্তি নেই!—অবশেষে তস্করের হাত ক্রমে এবার ভারতীয় যাদুঘর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বোধহয় সময় এসেছে আমাদের ক্রোধ পুঞ্জীভূত করবার।'

এরপর আনন্দবাজারের বিশেষ প্রতিনিধি মাত্র এক বছরের মধ্যে কতোগুলি মূল্যবান মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য অপহৃত হোয়েছে তার একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য লিপিবদ্ধ কোরেছেন।

পরিশেষে তাঁর বক্তব্য হোল : 'আমরা সত্যিই রাগতে পারি না, কোথায় প্রয়োজন ঘনীভূত ক্রোধ জানি না। এ-কথাটা লজ্জার সঙ্গে আরও স্বীকার করতে হচ্ছে এজন্যে, কারণ—বে-আইনী এবং যদৃচ্ছ হস্তান্তর থেকে দেশের শিল্পবস্তু রক্ষার জন্যে আইন থাকা সত্ত্বেও—প্রতি বছর কাষ্টমসের ফাঁক দিয়ে রাশি রাশি শিল্পবস্তু যে বাইরে চলে যাচ্ছে তার প্রমাণ ইউরোপ-আমেরিকার সতত জম-জমাট ভারতীয় শিল্পের বাজার।'

সান্নিধ্য : চিন্তামণি কর।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কর চিন্তামণি কর যিনি বহু বছর য়ুরোপে শিল্প-চর্চা সমাপনান্তে সম্প্রতি স্থায়ী হোয়েছেন কোলকাতায়। এখানকার সরকারী শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থাকাকালে তিনি 'সমকালীন' নামক মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে তাঁর স্বদেশ ও বিদেশের শিল্পজগতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কোরছিলেন। 'সমকালীনে' মুদ্রিত লেখাগুলি একত্রে গ্রথিত কোরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। গ্রন্থটির নাম : সান্নিধ্য। ইতালী, প্যারিস প্রভৃতি দেশের নবীন ও প্রবীন বহু ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে সাহচর্য ঘটেছিল তাঁর। তাঁদের অনেকেরই কথা জানা যাবে এ-গ্রন্থে। বইটি থেকে কিয়দংশ তুলে দিলাম হয়তো-বা এতে পাঠক-পাঠিকার বইটি পড়বার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।

'এক ঘণ্টা পরে ম্যাসিয়ের বলে "রোপো্যা"। স্পন্দন-হীনা মডেল, যে এতক্ষণ যেন যাদুতে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ম্যাসিয়েরের ওই মন্ত্রবাক্যে মায়াজাল ভাঙায় সে যেন ফিরে পেল তার নড়বার শক্তি। উঁচু করলো সে হাত দুখানা। হাত না হয়ে পাখা হলে মনে হতো সে যেন ডানা মেলে উড়ে যাবার প্রয়াসী। ঘাড়ের একদিকে মাথাটা হেলিয়ে তুলল একটা হাই। হাতের আড়াল দিয়ে হাই ঢাকবার ভান পর্যন্ত করল না। তার-পর ধীরে তুলল একটি পা, নামালো অতি সন্তর্পণে থ্রোন থেকে। পাশে চেয়ারে রাখা একটি ঝোলা গাত্রাবাস উঠিয়ে ঢেকে নিল নগ্ন শরীরের খানিকটা।

একটু আগে সে ছিল রূপরাজ্যের সিংহাসন-আসীনা দেবী, যার আদল নিয়ে এতগুলি পিগ্‌মেলিয়ান গড়ছিল তাদের গ্যালাতিয়া।'

বাংলা ভাষায় লেখা ভাস্কর চিন্তামণি করের এটি দ্বিতীয় গ্রন্থ। অনেক বছর আগে প্রকাশিত 'ফরাসী শিল্প ও সমাজ' অধুনা অলভ্য। (সান্নিধ্য : ত্রিবেণী প্রকাশন—২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : চার টাকা।)

মণি রায়চৌধুরী লিখিত 'শিল্পের গল্প'।

মণি রায়চৌধুরী 'শিল্পের গল্প'—এই নামে একটি গ্রন্থ রচনা কোরেছেন শিল্প-জিজ্ঞাসু কিশোর-কিশোরীদের জন্য। বইটির ভূমিকায় অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, 'রূপশিল্পের অনেক গভীর তত্ত্ব ও তথ্য তিনি (মণিবাবু) অতি সহজ ও সুমধুর ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি এই বইখানি লিখে রসিক ও অরসিক্ দুই সমাজেরই প্রভূত উপকার করেছেন। তিনি দেশী ও বিদেশী দুই শিল্পের মর্ম গ্রহণে সমান অধিকারী।'

শুধুমাত্র ভাস্কর্য-শিল্প সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিও এ বই থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। পরিশেষে শিল্প সম্পর্কে টেক্‌নিক্যাল ভাষাগুলির বাংলা প্রতিশব্দ দিয়ে ভালোই কোরেছেন। (শিল্পের গল্প : প্রদীপক প্রকাশনী, ৩৪ সি, চেতলা রোড, কোলকাতা। দাম : তিন টাকা)

সুন্দরম্-এর পরবর্তী সংখ্যা

দেওয়ালী উপলক্ষ্যে

রাষ্ট্র-ভাষায় একটি ছবির অ্যালবাম

হিসাবে প্রকাশিত হোচ্ছে।
বহু রঙিন চিত্র এবং বহু একরঙা চিত্রের
বিপুল সম্ভার। আগাগোড়া ইটালিয়ান
এবং প্রুভেন আর্ট কাগজে মুদ্রিত।

মূল্য : নাম মাত্র দুটাকা

হিন্দীর এজেণ্ট ও পুস্তক-বিক্রেতাগণ
অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

এই দেওয়ালী সংখ্যা উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের
ষষ্ঠ খণ্ড অগ্রহায়ণ মাসের পনরই তারিখে প্রকাশিত হবে।

সুন্দরম্ অফিস

৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭নং চৌরঙ্গি রোড, কোলকাতা-১৩। ফোন : ২৩-৯৭৭৭

ব্রাঞ্চ অফিস : চন্দননগর। স্ট্রান্ড—সাউথ এণ্ড। শুভম্। পূর্বেকার উডল্যাণ্ডস্ হোটেল।
ফোন : চন্দননগর ৩৬৪।

সুন্দরম্-এর

আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য—ষষ্ঠ খণ্ড
সপ্তম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ)
হিসাবে প্রকাশিত হবে।
ভারতবর্ষের তিনজন বিখ্যাত বাঙালী
ভাস্কর সম্পর্কে
প্রবন্ধ ও তাঁদের কাজের নিদর্শনাদি
এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

- রামকিঙ্কর বেইজ সম্পর্কে আলোচনা কোরেছেন শিল্পী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাস্কর রামকিঙ্করের বিভিন্ন মুডে কতকগুলি অনুপম রেখাচিত্র অঙ্কন কোরেছেন শিল্পী পঙ্কজ।
- চিন্তামণি কর সম্পর্কে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সিনহা-র প্রবন্ধটিও এই সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।
- শংখ চৌধুরী সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান একটি প্রবন্ধও এই সংখ্যার আকর্ষণ।

AN ENGLISH QUARTERLY

The Organ of Indian Art and Artists

Published

UNDER THE MANAGEMENT OF 'SUNDARAM'

- **Contributions from eminent artists and art critics.**
- **Innumerable multi-coloured illustrations.**
- **Printed on the best quality of imported art paper.**

DATE OF PUBLICATION : JANUARY—1963

Office :
6A, Satchidananda Chambers,
7, Chowringhi Road,
CALCUTTA-13
Telephone : 23-9777

With best Compliments of

KANORIA & CO.

PREM CHAND JUTE MILL

সুন্দরম্ সঙ্কলন গ্রন্থ। সুতো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং, ৭/১ নং গ্রাণ্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় দপ্তরের টেলিফোন : ২৩-৯৭৭৭